পূর্ণেন্দু পত্রী

কলকাতার প্রথম

কলকাতার প্রথম

পূর্ণেন্দু পত্রী

কলকাতার প্রথম

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

রূপুকে

যে আমার স্টাডির লাইব্রেরীয়ান

আর রুফ গার্ডেনের কেয়ার-টেকার

ভূমিকা

কলকাতাকে নিয়ে এটা আমার আট নম্বর বই। যখন লেখায় হাত দিই, তখন মনে হয়েছিল, এ বইটা লেখাই হবে আমার পক্ষে সবচেয়ে সহজ। কিন্তু লিখতে গিয়ে টের পেলাম, কাঁধ পেতেছি অসম্ভব কঠিন এক কাজে। প্রচুর বই থেকে তথ্য সংগ্রহ না করলে এ-বইকে শেষ করা দুঃসাধ্য। তা ছাড়া এর শেষও নেই বুঝি। কেননা এ-বইয়ে যা রইল তা ছাড়াও আরও অনেক প্রথম তো রয়ে গেল বাইরে। যেমন প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী, প্রথম চিত্রকর, প্রথম ডাক্তার, প্রথম শিশু পত্রিকা, প্রথম কবি, প্রথম স্কুল ইত্যাদি ইত্যাদি। এ বইটা যদি সমাদর পায়, তাহলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া রইল পরের খণ্ডটি হবে বাকি-পড়ে-যাওয়া প্রথমদের নিয়ে।

পূর্ণেন্দু পত্রী
সল্ট লেক সিটি
কলকাতা ৬৪

উইলিয়ম কেরী ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
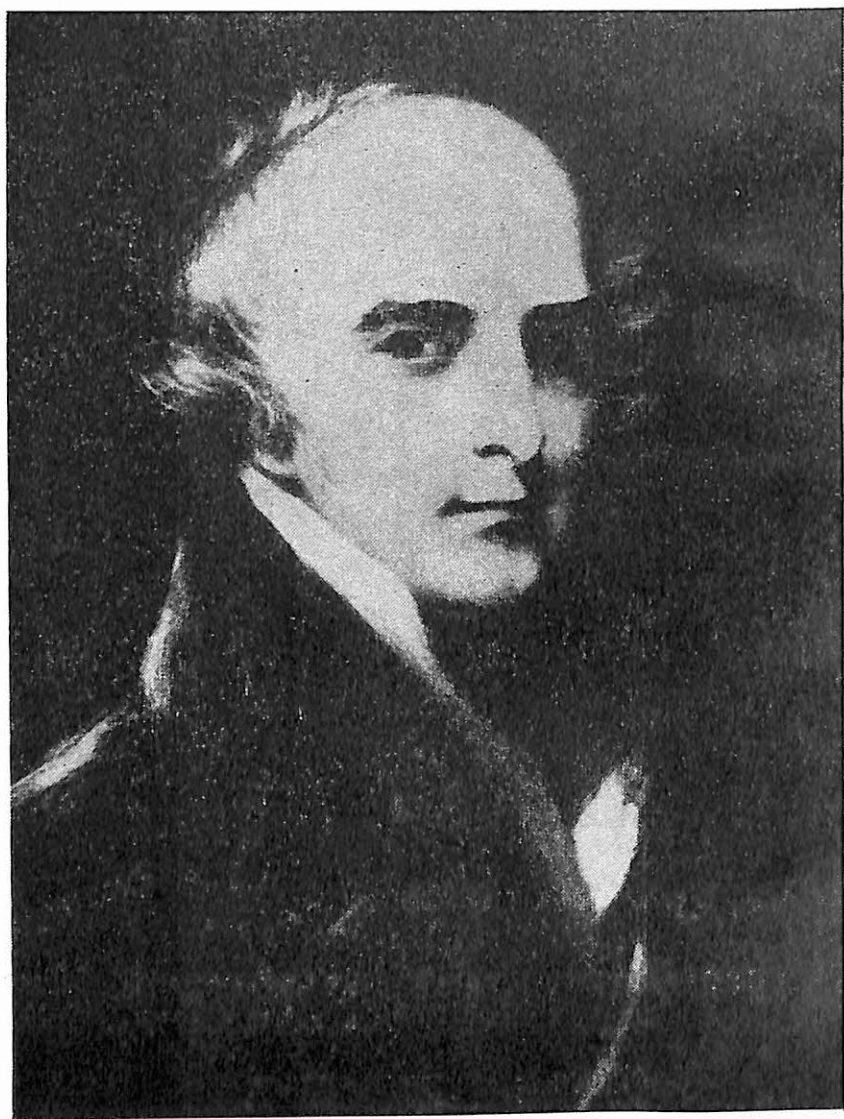
ওয়েলেসলী, ফোর্টউইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা।

ইডেন গার্ডেনের বিখ্যাত প্যাগোডা
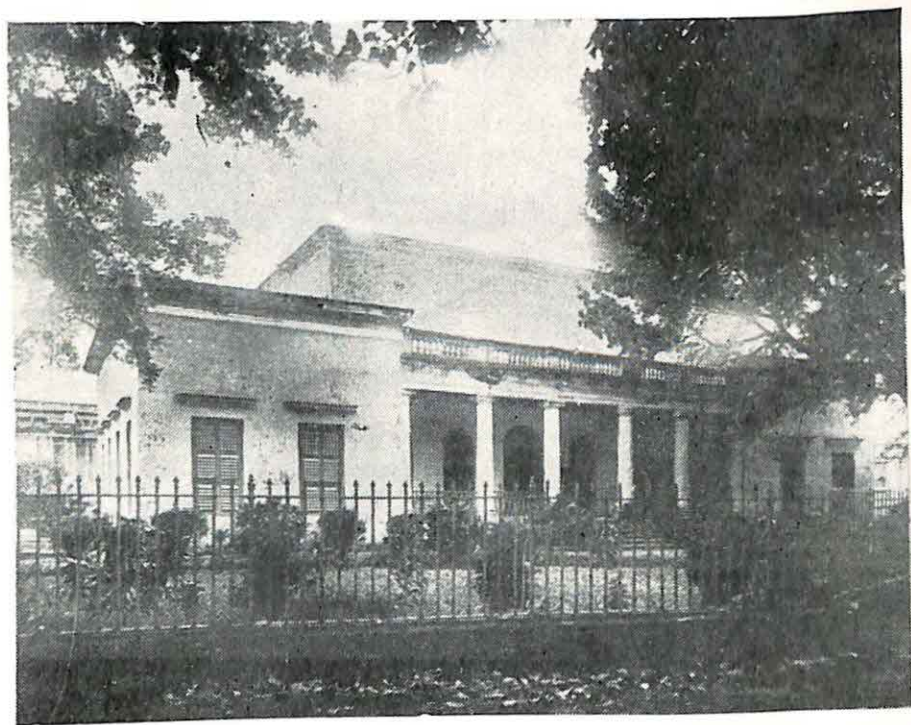
শ্রীরামপুরের মিশন চার্চ। যার কাছে বাংলার সাহিত্য কৃতজ্ঞ।
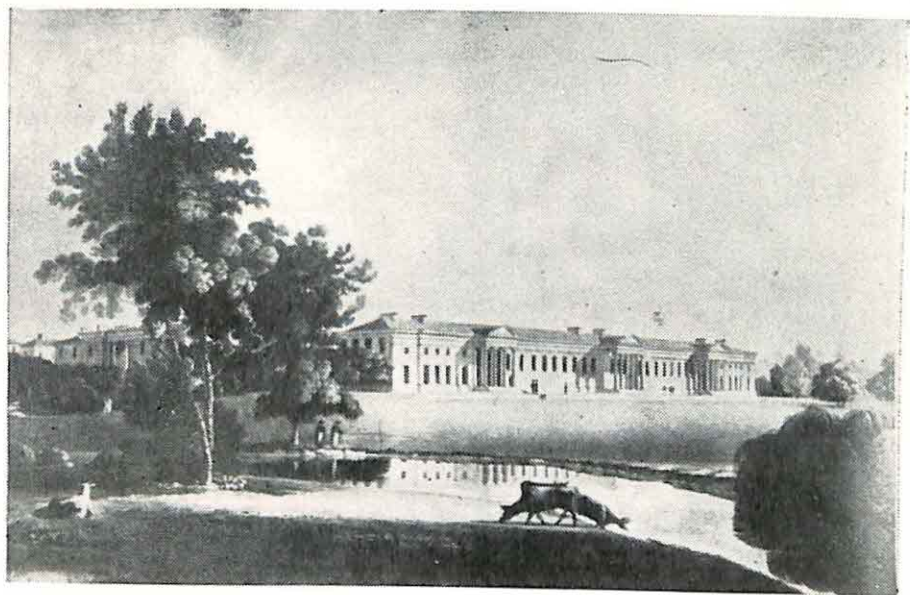
লণ্ডনের হেইলেবেরী কলেজ। এখান থেকেই
ইংরেজরা তৈরি করতো তাদের সিভিলিয়ান।

অন্নদামঙ্গল-এর কাছাকাছি সময়ে বাংলা বইয়ের গ্রন্থচিত্রন ।
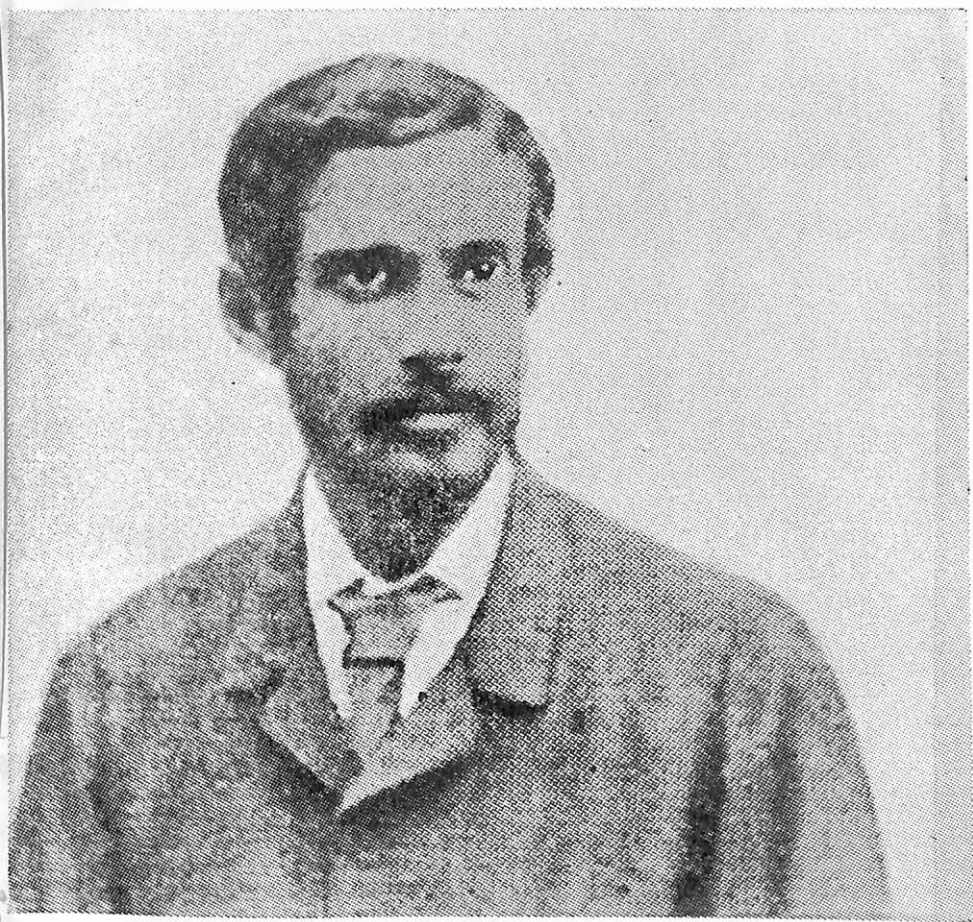
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী

প্রথম বই

আজকাল কত রকম বই পড়ি আমরা। গদ্যের, পদ্যের। গল্পের, উপন্যাসের। কবিতার, ছড়ার। তখন আমাদের মনে আসে না এই রকম প্রশ্ন যে, প্রথম বই ছাপা হলো কবে আমাদের দেশে। কিংবা প্রথম বইটা লিখলো কে। আর সেই প্রথম ছাপা বইটা গদ্যের, না পদ্যের।

অথচ এমন কিছু দূরের ঘটনা নয় এসব। এখন থেকে মাত্র ছুটো শতাব্দী পিছিয়ে গেলেই জানা হয়ে যাবে সব।

বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক গদ্যের বই লিখেছিলেন যিনি তিনি একজন বাঙালী। নাম, রামরাম বসু। আবার কেউ কেউ তাঁকে চিনতো 'কেরী সাহেবের মুন্সী' বলে। কেরী সাহেব মানে উইলিয়ম কেরী। ইংরেজ মিশনারী, কিন্তু বাংলা-অন্তপ্রাণ। বাংলার ভাষা, বাংলার ছাপা হরফ, বাংলার সাহিত্য, বাংলার গাছ-গাছালি, সব কিছুর জন্যেই তাঁর মনে অগাধ মায়া-মমতা। রামরাম বসু তাঁকে বাংলা শেখাতেন। সেই কারণেই ঐ নাম।

রামরাম বসুর জন্ম ১৭৭৫-এর কাছাকাছি সময়ে। মৃত্যু, ১৮১৩-য়। ১৮০০ সালের গোড়ার দিকে যোগ দিয়েছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে। এক বছর পরেই ছেপে বেরোল তাঁর লেখা প্রথম বাংলা গদ্যের বই, 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। ইংলণ্ড থেকে হুড়হুড় করে কলকাতায় ছুটে আসছে সে দেশের ছেলে-ছোকরারা, সিভিলিয়ান সাজে। কিন্তু এদেশে

এসে সরকারী কাজ চালাতে গিয়ে তাদের প্রথম দরকারী হয়ে উঠল এদেশকে জানা, এদেশের ভাষা, আচার-আচরণ, সংস্কৃতিকে বুঝে ওঠা। তখনকার গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলিই প্রথম অনুভব করেছিলেন এই সমস্যাটা। তাঁর তাগিদেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্ম।

আরবি জানা, ফারসী জানা, বাংলা জানা, যেখানে যত পণ্ডিত তাদের ডাক পড়ল ঐ কলেজে। বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হলেন কেরী সাহেব নিজেই। তাঁর অধীনে প্রধান পণ্ডিত হলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে রামরাম বসুকে ডেকে আনা হল পণ্ডিতের পদ দিয়ে, মাসে ৫০ টাকা মাইনে। চাকরীতে যোগ দিতে না দিতেই কেরী, মার্শম্যান এসে রামরাম বসুকে ধরলেন, একটা বাংলা বই লিখে দিন। কী নিয়ে লিখবেন, কাকে নিয়ে এই চিন্তায় রামরাম বসু যখন বিপন্ন, ঐ দুই সাহেবই তাঁকে বাতলে দিলেন বিষয়। আপনাদের দেশের প্রসিদ্ধ রাজা প্রতাপাদিত্যকে নিয়েই লিখুন। ও কাহিনী তো আপনাদের জানা।

রামরাম বসুর মনে দ্বিধার কাঁপুনি। পারবেন কী পারবেন না। কিন্তু কেরী নাছোড়বান্দা। অগত্যা কেরী সাহেবের এগিয়ে-দেওয়া কলম তুলে নিতে হল হাতে।

রামরাম বসুর জন্ম হুগলীর চুঁচুড়ায়। লেখাপড়া ২৪ পরগণার নিমতা গ্রামে। এদেশের আকাশে-বাতাসে খ্রীষ্টধর্মটাকে ছড়িয়ে দিতে হবে, এই ব্রত নিয়ে টমাস নামে একজন মিশনারী এসেছিলেন এদেশে। এদেশের লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে সবার আগে যেটা জানা দরকার, সেটা এদেশের ভাষা। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে টমাস পেয়ে গেলেন একদিন আলো অর্থাৎ যোগ্য শিক্ষক। টমাসকে তখন থাকতে হয় মালদহে। শিক্ষক রামরাম বসুকে টেনে নিয়ে চললেন সেইখানে। আর টমাসের সঙ্গে উঠতে-বসতে, লিখতে-পড়তে গিয়ে খ্রীষ্টান ধর্মটাকে ভালোবেসে ফেললেন একদিন। গানও লিখে বসলেন একটা লম্বা খ্রীষ্ট স্তোত্র।

কে আর তারিতে পারে
লর্ড জিজছ ক্রাইষ্ট বিনা গো
পাতক সাগর ঘোর
লর্ড জিজছ ক্রাইষ্ট বিনা গো। ইত্যাদি।

একবার লণ্ডনে চলে গিয়ে আবার ফিরে এলেন যখন সঙ্গে উইলিয়ম কেরী, মাসে কুড়ি টাকা মাইনে। রামরাম হয়ে গেলেন কেরীর মুন্সী। সেই থেকেই দুজনের ঘনিষ্ঠতা। তাই কেরীর অনুরোধে না বলা রামরামের পক্ষে অসম্ভব।

রামরামের লেখা 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'-র ভাষা পড়লে এখন হয়তো হাসি পাবে আমাদের। কিন্তু যখনকার কথা তখনকার সময়ে এটাই ছিল চমৎকার বাংলা গদ্য। একটু নমুনা শোনা যাক।

"দৈবক্রমে দেখ এক দিবস মহারাজা স্নান করিয়া সিংহাসনের উপর গাত্র মোচন করিতেছিলেন। একটা চিল্ল পক্ষী তিরেতে বিদ্ধিত হইয়া শূন্য হইতে মহারাজার সন্মুখে পড়িল অকস্মাৎ ইহাতে রাজা প্রথমত তটস্থ হইয়া চমকিৎ ছিলেন পশ্চাৎ জানিলেন তিরে বিদ্ধিত চিল্ল পক্ষী, লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ চিল্লকে কেটা তির মারিয়াছে। তাহারা তত্ত করিয়া কহিল মহারাজা কুমার বাহাদুর তির মারিয়াছেন এ চিল্লকে।" রামরাম বসু বইটার নাম দিয়েছিলেন বিরাট।
"রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র যিনি বাস করিলেন যশহরের ধূমকাটে একব্বর বাদসাহের আমলে।" একব্বর বাদশাহ মানে আকবর বাদশা।

বাংলা ভাষায় বাঙালীর লেখা প্রথম গদ্যের বই লেখা যেদিন শেষ হল, কেরী সাহেবের কী আনন্দ! আহ্লাদে যেন আটখানা। তখুনি কলম নিয়ে বসে গেলেন চিঠি লিখতে, কলেজের হর্তাকর্তাদের কাছে। রামরাম বসু যে দারুণ কাজটা করেছে, তার জন্যে তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হোক।

কর্তৃপক্ষও মাথায় তুলে নিলে সে প্রস্তাব। মঞ্জুর করা হল সঙ্গে সঙ্গে তিনশো টাকার পুরস্কার। অল্পদিনের মধ্যে মারাঠী ভাষাতেও অনুবাদ

করা হল এই বইয়ের। অনুবাদ করলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেরই আর এক পণ্ডিত। নাম বৈদ্যনাথ। তিনিও পুরস্কার পেলেন তিনশো টাকা। রামরাম পরের বছর বই লিখেছিলেন আরও একটা। নাম, লিপিমালা। বাংলাভাষা গড়ে ওঠার সেই আদ্যিকালে, রামরাম বসুর লেখা বাংলা ভাষার গঠনটা কেমন ছিল তার নমুনা তুলে দিচ্ছি খানিকটা।

"কিঞ্চিত পরে মহারাজা বালক আপন স্থানে বিদায় করিয়া দিলে ভ্রাতা বসন্ত রায়কে সাতে করিয়া পূজার অট্টালিকায় নিভৃতি স্থানে গতি করিলেন এবং কহিলেন তাহাকে এই যে আমার বালক ইহাকে তুমি কি জ্ঞান করছ। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন মহারাজা ইহার লক্ষণা পেক্ষণে বুঝা যায় এ অতি উন্নত হবেক দৈব ভাগ্য ইহার অধিক জানা যায়।"

একটু আগেই বলেছি, রামরাম বসুকে পুরস্কার দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে কেরী সাহেব চিঠি লিখেছিলেন কলেজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের কাছে। তাতে কিন্তু রামরাম ছাড়াও আরো একজনের নাম ছিল। তিনি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত হিসেবে কেরী সাহেব তাঁকেও বাংলা ভাষায় একটা বই লিখতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, 'অভিনব যুবকসাহেব জাতের শিক্ষার্থে'। রামরাম যখন নিজের ভাষায় লিখে চলেছেন রাজা প্রতাপাদিত্যের চরিত কথা, মৃত্যুঞ্জয়ও তখন লিখে চলেছেন নিজের ভাষায় অন্য এক জিনিস। সেটা অনুবাদ। সংস্কৃত থেকে বাংলায়। বইয়ের নাম 'বত্রিশ সিংহাসন'।

মৃত্যুঞ্জয় তখনকার কালের ডাকসাইটে পণ্ডিত। যেমন, বাংলা তেমনি সংস্কৃতে, সমান পণ্ডিত। ১৫ বছর একটানা চাকরী করেছেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে। তারপর যোগ দিয়েছেন সুপ্রীম কোর্টে।

মোট চারখানা বই লিখেছিলেন তিনি। প্রথমটা 'বত্রিশ সিংহাসন'। তারপর একে একে 'হিতোপদেশ', 'রাজাবলি', 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'। 'বত্রিশ সিংহাসন' সংস্কৃত থেকে অনুবাদ। 'হিতোপদেশ'ও তাই। পঞ্চতন্ত্র থেকে অনুবাদ। 'রাজাবলি' নিজের লেখা। এই বই সম্বন্ধে বলা হয়, "কলির আরম্ভ হইতে ইংরেজ অধিকার পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটগণের

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। ইহাই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত ভারতবর্ষের প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস।"

এবার 'বত্রিশ সিংহাসন' থেকে মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্য লেখার একটু নমুনা। "এক কালে এক ব্যাঘ্র সেখানে আইল ব্যাঘ্রকে দেখিয়া বিজয়পাল গাছের উপরে চড়িলেন সেই গাছে এক বানর ছিল। সেই বানর রাজপুত্রকে কহিল হে রাজপুত্র কিছু ভয় নাহি উপরে আইস। বানরের কথা শুনিয়া রাজপুত্র উচ্চেতে গেলেন। সন্ধ্যাকাল হইলে রাত্রিতে রাজকুমারের আলস্য দেখিয়া বানর কহিলেন হে রাজপুত্র বৃক্ষের নামতে ব্যাঘ্র আছে তুমি আমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাও। রাজপুত্র সেইরূপ নিদ্রা গেলেন।"

এ কালের সমালোচক প্রমথ চৌধুরী সেকালের ঐ মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে বলেছেন—"তিনি একদিকে যেমন সাধুভাষায় আদি লেখক অপর দিকেও তিনি তেমনি চল্‌তি ভাষার আদর্শ লেখক।"

প্রথম সচিত্র বই

প্রথম ছাপাখানা কিন্তু কলকাতায় নয়। শ্রীরামপুরে। আবার বাঙালীর হাতে গড়া প্রথম ছাপাখানার কথা উঠলে যাঁর নাম করতে হবে, তাঁরও ছাপা-শেখার হাতে-খড়িটা ঐ শ্রীরামপুরেই। এই যে একটু আগে প্রথম বাংলা বই-এর গপ্পো শুনলে, সেটাও কিন্তু ঐ শ্রীরামপুরেই ছাপা। কলকাতা আর শ্রীরামপুরের মধ্যে তখন ছিল একটা নাড়ীর যোগ। একেবারে গোড়া থেকেই তাকানো যাক ব্যাপারটার দিকে।

ছাপাখানার যন্ত্র বিদেশ থেকে ভারতবর্ষের যে-জায়গাটায় প্রথম এসে পেঁছিয়, তার নাম গোয়া। গোয়ার দুশো বছর পরে বাংলাদেশের হুগলীর শ্রীরামপুরে। সাহেব আর মিশনারী সাহেব দু-পক্ষেরই তখন বাংলাভাষাটা জানা আর প্রচার করার ভীষণ রকমের দরকার। এক-দলের দরকার নিজেদের রাজকর্মীদের শেখানোর জন্যে, যাতে শক্ত হাতে দেশশাসন করতে পারে। আরেক পক্ষের দরকার খ্রীষ্টধর্মটা যাতে জন-সাধারণের কাছে পেঁছে যেতে পারে। অবশ্য ওয়ারেন হেস্টিংস যিনি তখনকার ভারতবর্ষের গভর্নর আর উইলিয়াম জোন্স যিনি তখনকার কলকাতায় সুপ্রীম কোর্টের জজ, এঁদের দু'জনের ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষাটা ছিল আরো একটু বড়ো। এঁরা চেয়েছিলেন ভারতবর্ষটাকে জানতে। তাই বাংলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত আর ভারততত্ত্বের দিকেও নজরটা ছিল ছড়ানো। ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড জোন্স-এর শিষ্য। হেস্টিংস-এর

অনুরোধে বাংলাদেশের মাথা-মাথা পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে ইনি ইংরেজীতে অনুবাদ করলেন মনুসংহিতা আর ভারতীয় আইন-কানুনের বই। এর পরেই মন দিলেন বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনায়। যাতে সাহেবরা এদেশের ভাষাটা শিখতে পারে সহজে ' প্রথম বই, যার নাম 'এ কোড অফ জেণ্টু লজ,' ছাপা হয়েছিল লণ্ডনে। কারণ তখনও বই ছাপার মতো কোনো ছাপাখানা ছিল না এদেশে। দ্বিতীয় বই, যার নাম 'এ গ্রামার অফ দি বেংগল ল্যাঙ্গুয়েজ', সেটা যাতে এদেশে ছাপানো যায়, তার জন্যে তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল শ্রীরামপুরে।

এতবড় কলকাতা পড়ে থাকতে শ্রীরামপুরে কেন চলে গেল ছাপাখানা ? এর পিছনে অনেক ইতিহাস। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ছাপাখানা তৈরির উদ্যমটা প্রথম আসে উইলিয়াম কেরীর মাথায়। কিন্তু যে-সময়ের কথা তখন জবর লড়াই জমে উঠেছে য়ুরোপে, ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মাথায় তখন চেপে বসেছে ফরাসী-ভূতের ভয়। নিজের দেশের মিশনারীদেরও বিশ্বাস করতে পারে না তারা। ভাবে ছদ্মবেশী গুপ্তচর বুঝি। তাই কলকাতার ঘাটে পা ফেলার হুকুম নেই কারো। দিনেমাররা এ-সব যুদ্ধ-টুদ্ধর বাইরে। তাই মিশনারীরা সহজেই নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে যায় সেখানে। উইলিয়াম কেরী তাঁর প্রথম ছাপাখানাটা খুলতে চেয়েছিলেন খিদিরপুরের মদনবাটিতে। কিন্তু সাহায্য করার চার সঙ্গী—ওয়ার্ড, মার্শম্যান, গ্র্যাণ্ট আর ব্রান্সডন কলকাতায় নামার অনুমতি না পেয়ে শ্রীরামপুরে চলে গেলেন যখন, বাধ্য হয়েই কেরীকেও তাঁর স্বপ্নের ছাপাখানাটাকে বুকে জড়িয়ে চলে আসতে হল শ্রীরামপুরেই।

কেরীর ছাপাখানাটাও ছিল অদ্ভুত। এখনকার মতো লোহা-লক্কড়ে তৈরি নয়। কাঠের। বন্ধু জর্জ উডনি-র উপহার। নৌকোয় চেপে সে ছাপাখানা যেদিন মদনবাটীতে এসে পৌঁচেছিল, গ্রামের মানুষ-জন দেখে বিস্ময়ে হতবাক। তারা ঐ ছাপাখানার নাম দিয়েছিল 'সাহেবদের ঠাকুর'।

শ্রীরামপুরের ছাপাখানা থেকেই একদিন ছেপে বেরোল হ্যালহেডের ব্যাকরণ। আর ছাপার ব্যাপারে তাঁকে প্রাণপণ সাহায্য করলেন

তুজন মানুষ। একজন ইংরেজ, আর একজন বাঙালী। ইংরেজের নাম চার্লস উইলকিন্‌স। বাঙালীর নাম, পঞ্চানন কর্মকার। ছেনী-কাটা হরফ তৈরির রাজা ছিলেন পঞ্চানন।

শ্রীরামপুরের এই ছাপাখানাতেই কম্পোজিটারের চাকরী করতেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। শ্রীরামপুরের কাছাকাছি বহরা-য় বাড়ি। বেশ কিছুদিন চাকরীর পর কলকাতায় এসে মন দিলেন বাংলা বই ছাপার দিকে। নিজের ছাপাখানা নেই বলে প্রথম বইটা ছাপলেন ফেরিস অ্যাণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানায়। বইয়ের নাম 'অন্নদামঙ্গল'। ভারতচন্দ্রের লেখা। ভিতরে ৬ খানা ছবি। ধাতু খোদাই আর কাঠ খোদাই মিলিয়ে। বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে 'অন্নদামঙ্গল' পেয়ে গেল তু'রকমের সম্মান। প্রথম সম্মান। পাঠকদের চাহিদা। দ্বিতীয় সম্মান, ঐ 'অন্নদামঙ্গল'ই বাংলা বইয়ের জগতে হয়ে উঠল প্রথম সচিত্র বই। পথ দেখালেন গঙ্গাকিশোর। এর পরে ছবি দিয়ে বই সাজানোটা হয়ে উঠল যেন অনেকটা নিয়মের মতোই।

গঙ্গাকিশোরের সময়ে বই ছাপানোর হাজার ঝকমারি। হিন্দু-সমাজের হাড়ে-মাসে জড়ানো তখন নানান রকমের সংস্কার। সাহেবদের বেনিয়াগিরি করেই হঠাৎ বড়লোক। এদিকে কেউ সাহেবদের দেশে গেলে, তাকে করা চাই একঘরে। শেষ পর্যন্ত গোবর-গঙ্গাজল খাইয়ে প্রায়শ্চিত্তি। বই-এর বেলাতেও নিস্তার নেই এই ছোঁয়াছুঁয়ির সমস্যার। তাই ছাপাখানা দেখলেই চোখ বুজিয়ে বসতেন ধার্মিক হিন্দুরা। মুখে, নারায়ণ! নারায়ণ! তাদের কাছে ছাপা বই মানেই অস্পৃশ্য, অচ্ছুত। সেটা যদি আবার ধর্মের বই হয়, তাহলে তো কথাই নেই। আগুনে পোড়াতে পারলে বাঁচা যায় যেন। বিদেশী-বিজাতীয়দের প্রেসে ছাপা হবে ধর্মের বই? এসব হোল পাদরীদের ষড়যন্ত্র। এমনও নাকি ঘটেছে যে ছাপাখানা বা ছাপা বই দেখে কোনো কোনো ধার্মিক তিনবার ডুব দিয়ে এসেছেন গঙ্গাজলে।

অবশ্য গঙ্গাজলে শুদ্ধ করে নিলে, সাত খুন মাপ। আর সেটাই

করতে হয়েছিল ভবানীচরণকে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'শ্রীমদ্‌ভাগবত' ছাপলেন তখন তাঁকে বিজ্ঞাপন দিয়ে আগাম জানাতে হল যে, এ বই ছাপা হয়েছে বিশুদ্ধ হিন্দু মতে। অর্থাৎ কম্পোজ করেছে গোঁড়া ব্রাহ্মণ। ছাপার কালি তৈরি হয়েছে বিশুদ্ধ গঙ্গাজল মিশিয়ে। আর বইয়ের আকার দেওয়া হয়েছে অবিকল প্রাচীন পুঁথির।

'অন্নদামঙ্গল' ছাপার পরেই গঙ্গাকিশোরের বরাত গেল খুলে। সচিত্র হওয়ার ফলে শুধু কলকাতায় নয়, গ্রাম বাংলাতেও ছড়িয়ে পড়ল এ বইয়ের কদর। লাভের কড়ি দিয়ে গঙ্গাকিশোর এরপর খুলে বসলেন নিজের ছাপাখানা আর নিজের বই বিক্রীর দোকান। ছাপাখানার নাম 'বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস'। পরে এই ছাপাখানা থেকেই তিনি বের করেছিলেন বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেট'।

গঙ্গাকিশোরের 'অন্নদামঙ্গল' পরোক্ষভাবে অনেক উপকার ঘটিয়ে দিল বাংলা বইয়ের। বাংলাদেশে বই-ব্যাবসায় যুক্ত হল শিল্পীরা। চর্চা শুরু হল কাঠখোদাই আর ধাতুখোদাই ছবির। কে কত বেশী আর কত ভালো ছবি দিয়ে বইকে সাজাবে তারও গোপন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল যেন বটতলার বই পাড়ায়। বইয়ের ছবি আঁকার সুবাদে শিল্পীরা সম্মানিতই হলেন না শুধু, শিল্পীদের মনেও পেখম ছড়াল সৃষ্টির উল্লাস।

প্রথম নাটক

তখনও আমাদের দেশে নাটক লেখার, নাটক দেখার খুব চল হয়নি। দু-একজন শখ করে লিখেছেন যদিবা, সেগুলোর অভিনয় নিয়ে মাথা ঘামানো নেই কারুর। সেই রকম একটা সময়ে হঠাৎ 'রঙ্গ-পুর বার্তাবহ' নামের একটা কাগজে ছাপা হয়ে বেরুল এক অদ্ভুত বিজ্ঞাপন। তারিখটা ছিল ১৮৫৩ সালে ৮ নভেম্বর।

বিজ্ঞাপনটা 'নাটক চাই'-এর। ছ মাসের সময় তার মধ্যে একটা নাটক লিখে দিতে হবে। নাটকের নাম হবে 'কুলীন কুল সর্বস্ব'। ভাষা হবে গৌড়ীয়। স্বাদ হবে মনোহর। যিনি পারবেন, তাঁকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কার দেবেন, রংপুরের সম্ভ্রান্ত রায়-চৌধুরী পরিবারের শ্রীকালীচন্দ্র। রায়চৌধুরীরা রংপুরে কুণ্ডী পরগণার জমিদার। এঁদের পরিবারে শিল্প-সংস্কৃতির বেশ চর্চা ছিল।

ছ মাস শেষ হতে না হতেই কালীচন্দ্রের হাতে এসে পৌঁছল একটা নাটক। পড়ে তিনি তো মুগ্ধ। এ রকম নাটক তো আগে কেউ কোনো দিন লেখেনি আমাদের দেশে। কে এর লেখক ? কী তার নাম ? লেখকের নাম লেখা ছিল সঙ্গের চিঠিতে। রামনারায়ণ দেবশর্মণঃ। কলকাতার হিন্দু মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক। কালীচন্দ্র নিজের কথা রাখলেন। রামনারায়ণকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার তো দিলেনই, তাছাড়া ওই নাটক-টাকে বই করে ছাপানোর জন্যে উপহার দিলেন আরও পঞ্চাশ টাকা।

'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটকের বই ছেপে বেরুল। জ্ঞানীগুণীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল ওই নাটক নিয়ে। বলা হয় এইটেই বাংলাভাষার আদি নাটক। তথ্যের দিক থেকে কথাটা হয়তো ঠিক নয়। কেননা, রামনারায়ণের আগে আরও বেশ কিছু নাটক লেখা হয়ে গেছে বাংলা-ভাষায়। যেমন ধরো যোগেন গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস'। তারাচরণ শিকদারের 'ভর্দ্রার্জুন'। হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতি চিত্ত বিলাস'। তারপর বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু'। একটা আধটা নয়, এতগুলো নাটক লেখা হয়ে গেছে। তবু বিদ্বান-বুদ্ধিমানেরা বললে, ওগুলো ঠিক নাটক হয়ে ওঠে নি। রঙ্গমঞ্চে ওদের অভিনয়ও হয় নি কোনো দিন। নাটকের সত্যের দিক দিয়ে এইটেই প্রথম সামাজিক নাটক আমাদের দেশে।

অল্প দিনের মধ্যে নাট্যকার হিসেবে নামডাক ছড়িয়ে পড়ল রাম-নারায়ণের। সেইসঙ্গে তাঁর নামটাও গেল পালটে। লোকে ভালো-বেসে তাঁর নতুন নামকরণ করলে 'নাটুকে রামনারায়ণ'। গড় গড় করে আরও বহু নাটক লিখে চললেন তিনি। সেগুলো হচ্ছে, 'বেণী-সংহার', ১৮৫৬ সালে। 'রত্নাবলী নাটক', ১৮৫৮ সালে। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' ১৮৬০ সালে। 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' ১৮৬৫-তে। 'নব নাটক', ১৮৬৬-তে। এই 'নব নাটক' লেখার পিছনে বেশ মজার ইতিহাস আছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর গুণেন্দ্রনাথ ছিলেন নাটক-পাগলা মানুষ। একদম ছেলেবেলা থেকেই। তখনকার কলকাতায় গোপাল উড়ের যাত্রা ছিল খুব বিখ্যাত। সেই যাত্রা শুনে দুই ঠাকুরের ইচ্ছে হল, নিজেরা একটা নাট্যশালা বানাবেন ঠাকুরবাড়ির ভিতরেই। যেমন কথা, তেমনি কাজ। তৈরি হয়ে গেল জোড়াসাঁকো নাট্যশালা। এবার চাই নাটক। কিন্তু নাটক কই? না, অভিনয় করার মতো ভালো নাটক তো মিলছে না কোথাও। তাহলে এক কাজ করা যাক। এসো 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজে' একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দি। বিজ্ঞাপনও দেওয়া হলো। বহুবিবাহের কুপ্রথার উপর একটা সরস-সরেস

নাটক চাই। এই সময় কে যেন এসে বললে, আরে নাটুকে-রামনারায়ণ থাকতে তোমরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছ, নাটকের জন্যে? হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো। বিজ্ঞাপন তুলে নেওয়া হল তৎক্ষণাৎ। রামনারায়ণকে অনুরোধ জানাতেই তৈরি হয়ে গেল 'নব নাটক'। সংক্ষেপে 'নব নাটক'। আসল নামটা রেলগাড়ির মতো লম্বা। 'বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নবনাটক'। সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকারকে পুরস্কার দেওয়া হল দুশো টাকা। রামনারায়ণের প্রত্যেকটা নাটকের পিছনেই রয়েছে এই রকম পুরস্কার পাওয়ার ইতিহাস।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ছেলেবেলার গল্প বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন এই 'নব নাটক' পালার অভিনয় কালের অনেক কথা।

"আমি ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসবার দুই বৎসর পরে ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসে দেখি তাঁদের (গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) বাড়িতে 'নবনাটক' অভিনয়ের প্রভূত আয়োজন হয়েছে— আমি সেই সমারোহের মধ্যে এসে পড়ি।... আমাদের বাড়ির ছেলের আত্মীয় স্বজন বন্ধু সেই নাটকের পাত্রপাত্রী সেজেছিলেন। মেয়ের পার্ট অবিশ্যি পুরুষদের নিতে হয়েছিল।... আমাদের বন্ধু অক্ষয় মজুমদার নাট্যের প্রধান নায়ক গবেশবাবু সেজেছিলেন— নাট্য অভিনয়ে সেই তাঁর প্রথম উদ্যম। পরে তিনি ঐ ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর আরো উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। তাঁকে ছেড়ে আমাদের কোন অভিনয় সিদ্ধ হতনা।"

জোড়াসাঁকো-নাট্যশালায় নব-নাটকের অভিনয় হয়েছিল কিভাবে সেটার দিকেও তাকিয়ে নেওয়া যাক এক ঝলক। স্টেজ বাঁধা হয়েছিল দোতলার হল ঘরে। পটুয়াদের ডাকিয়ে আঁকানো হয়েছিল দৃশ্যপট। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে সে দৃশ্যপটের যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটা খুবই মজার।

"দৃশ্যগুলি বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীনখানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আঠা দিয়া জুড়িয়া অতি সুন্দর ও সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে যেন সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত।"

নব-নাটক অভিনয়ের সময় কনসার্ট-এ যে-সব বাজনা বাজানো হয়েছিল, তার মধ্যে বেহালা, পিকলো, ক্লারিওনেট, বড় বাস, করতাল, ঢোল, তবলা আর মন্দিরা-র সঙ্গে ছিল হার্মোনিয়মও, ঠাকুরবাড়ির লোকেরাই বাজনার জগতে টেনে আনেন হার্মোনিয়মকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেও বাজাতে জানতেন ভালো রকম। এই বাজনা দিয়ে 'নব নাটক' অভিনয়ের দিন মজার কাণ্ড হয়েছিল একটা।

তখন হাইকোর্টের যিনি বিচারপতি, তাঁর নাম সীটন কার। ঠাকুরবাড়িতে তিনি এসে বসেছেন সেদিনের 'নব নাটক' অভিনয়ের দর্শকের চেয়ারে। নাটক দেখতে দেখতে কনসার্ট শুনে জুড়িয়ে যাচ্ছে কান। কী অপূর্ব! নাটক শেষ হতেই কনসার্ট-ঘরের দিকে পা বাড়ালেন, কনসার্টে কী কী যন্ত্র বাজানো হয়েছিল নিজের চোখে দেখে নিতে। ঘরে ঢুকেই লজ্জায় জিভ কেটে, 'বেগ ইয়োর পার্ডন, জেনানা জেনানা' বলে বেরিয়ে এলেন তিনি। আসলে সে ঘরে জেনানা অর্থাৎ মহিলা বলতে হাজির ছিলেন না কেউই। ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তিনি তো শুধু অভিনয়েই নেই, আছেন গান-বাজনাতেও। সেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে দেখেই চমকে উঠেছিলেন কার সাহেব। ওঠবারই কথা। কারণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গে তখন মেয়েদের সাজগোজ। 'নব নাটকে' তাঁর চরিত্র ছিল 'নটী'-র।

প্রথম বাংলা নাট্যশালা

প্রথম নাটকের পরেই মনে পড়ে প্রথম নাট্যশালার কথা। বাংলা নাট্যশালার ব্যাপারটা ভারি মজার। সে নাট্যশালায় প্রথম অভিনয় হয়েছিল যে নাটক, তার ভাষাটা বাংলা কিন্তু মূল ইংরেজি। আর যিনি সে নাট্যশালার জনক, তিনি বাঙলা প্রেমিক কিন্তু জাতিতে রুশ। নাম গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেদেভ। ভারতবর্ষে বেড়াতে এসে ভালোবেসে ফেলেছিলেন এদেশের আকাশ-মাটি, নদী-পাহাড়, মানুষ-সভ্যতা সব কিছু। গুণে গুণে দশটা বছর কাটিয়েও গেছেন এদেশে। শিখেছেন এখানকার ভাষা। অর্থাৎ বাংলা। অন্য ভাষার সাহিত্যকে অনুবাদ করেছেন বাংলায়। আবার বাংলা ভাষার লেখাকে অন্য ভাষায়।

লেবেদেভের মধ্যে গুণ ছিল অনেক। শুধু প্রাচ্য ভাষায় পণ্ডিত এইটুকু বললেই বলা হয় না সব। জানতেন গান-বাজনা। নিজের গান গেয়েছেন বেহালা বাজিয়ে। অভিনয়ের ক্ষমতা ছেলেবেলা থেকেই। যেহেতু একাধিক ভাষা জানা, তাই অনুবাদের হাত পাকা। মনটা বিজ্ঞানীর। আর মেজাজটা পর্যটকের। পর্যটক হিসেবেই হঠাৎ একদিন কলকাতার মাটিতে পা, হঠাৎ বললে হয়তো ভুলই বলা হয় কিছুটা। আবার এত দেশ থাকতে কেন বাংলাদেশের কলকাতায় সে কথা বলতে গেলে তার পিছনকার ইতিহাসটাকে টেনে আনতে হয় সামনে।

সে অনেককাল আগের কথা। ভারতবর্ষে তখন মোগল আমল। রাশিয়া থেকে ভারতবর্ষে বেড়াতে এলেন একজন বণিক। নাম, আফানিসি নিকিতিন। উদ্দেশ্য একটাই। এই দেশটাকে নিজের চোখে দেখা। দেখে নিজের দেশে ফিরে গিয়ে ভারতবর্ষের কথা জানানো। ভারতবর্ষ সম্পর্কে রাশিয়ার মানুষের মনে তখন বেশ এক ধরনের কৌতূহল। বারো-তেরো শতাব্দীতে ভারতবর্ষের খবরটা প্রথম পৌঁছোয় রাশিয়ায়। যে বইয়ের মাধ্যমে পৌঁছোয় তার নাম 'দি রিলেশন অ্যাবাউট ইণ্ডিয়া' অথবা 'দি স্টোরী অফ ইণ্ডিয়া দা রিচ'। সে বইয়ে মধ্যযুগের ভারতবর্ষ সম্পর্কে এমন সব আশ্চর্য কথাবার্তা, যা শুনে যে-কোনো লোকেরই মনে হবে এমন সোনার দেশে এখুনি পৌঁছতে না পারলে জীবনটাই মিথ্যে। আফানিসি নিকিতিন ছুটে এসেছিলেন সেই আশ্চর্যের টানেই। সাধারণ মানুষের মতোই ঘুরে বেড়িয়েছেন এদেশের প্রায় সবখানেই, সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে। যেমন দেখেছেন রাজকীয় শোভাযাত্রার বিপুল সমারোহ, তেমনি দেখেছেন গ্রামের গঞ্জের গরীব-গুরবো মানুষের হাট-ঘাট। দেশে ফিরে যে বই লিখলেন, তার নাম 'জার্নি বিয়ণ্ড দা থ্রি সী'। অনেকটা ডায়েরির মতো লেখা। আফানিসির ডায়েরি নতুন করে রাশিয়ার মানুষের মনে জাগাল ভারতবর্ষ সম্পর্কে আগ্রহ। লেবেদেভ পা বাড়ালেন ভারতবর্ষের দিকে। আগে কিছু সময় দক্ষিণ ভারতে কাটিয়ে পরে ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতায়। সালটা ১৭৮৭। বাংলাদেশে ইংরেজ-শাসনের তিরিশ বছর সেটা। কলকাতায় পৌঁছেই মন দিলেন এদেশের ভাষাকে আয়ত্ত করতে। একসঙ্গেই চলল বাংলা, সংস্কৃত আর হিন্দী এই তিনটে ভাষার চর্চা। তারপরেই রুশ ভাষায় অনুবাদ করলেন ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'। লিখলেন এদেশের ভাষা নিয়ে ব্যাকরণ-ঘেঁষা একটা বইও। যখন দক্ষিণ ভারতে ছিলেন, তামিল ভাষাটাও রপ্ত করেছিলেন অনেকখানি। রাশিয়ায় তিনি এসবের জন্যেই 'দি ফার্স্ট রাশিয়ান ইণ্ডোলজিস্ট' অর্থাৎ প্রথম রুশ প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ হিসেবে সম্মানিত।

কলকাতায় এসে পেয়ে গিয়েছিলেন স্বদেশের এক বন্ধুকে। অল্প দিনের মধ্যে কলকাতার মানুষও হয়ে উঠলো তাঁর বন্ধুর মতো। বেহালা বাজানোটাই ছিল তাঁর পেশা। আর এই বাজনার সুবাদেই কলকাতার স্কুল শিক্ষক গোকুলনাথ দাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। পরে তিনিই হয়ে দাঁড়ান তাঁকে ভারতীয় ভাষা শেখানোর শিক্ষক। বাংলা ভাষাটা যখন বেশ সড়গড় হয়ে গেছে, তখন একদিন হঠাৎ নিজের খেয়ালেই ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে বসলেন দু'খানা নাটক। একটা জড্রেলের 'দি ডিসগাইস'। আর একটা ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের 'লাভ ইজ দা বেস্ট ডক্টর'। দুটোই হাসির নাটক, অর্থাৎ প্রহসন। অনুবাদ শেষ হতেই আমন্ত্রণ জানালেন বাঙালী পণ্ডিত-বন্ধু-বান্ধবদের। তাদের সামনেই পড়ে শোনালেন 'দি ডিসগাইস'-এর অনুবাদ। কোনো কোনো অংশ সত্যই এমন মজার, যে কলকাতার বাঙালী পণ্ডিতরা হেসে লুটো-পুটি। এর ক'দিন পরেই শিক্ষক গোকুলনাথের কাছ থেকে এক অবাক করা প্রস্তাব। আপনি যদি নাটকটাকে মঞ্চস্থ করতে চান, তাহলে জোগাড় করে দিতে পারি বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রী। এ কী শুনছেন তিনি ? আকাশের কোনো দৈব-কণ্ঠস্বর ? নাকি স্বপ্নের ভিতর থেকে উঠে আসা কোনো অলীক সংলাপ ? কিন্তু না, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বাস্তব গোকুলনাথ। বলশয়ের দেশের মানুষ, নাটক আর নাট্যশালা যাদের রক্তে, তিনি আবার না বলবেন নাকি এমন মন-মাতানো প্রস্তাবে। লেবেদেভ তৎক্ষণাৎ রাজি। কিন্তু অভিনয়টা হবে কোথায় ? নাট্যশালা কই ? কিন্তু নাট্যশালা নেই বলে কি চোখ থেকে মুছে ফেলবেন স্বপ্ন-সংকল্পের কাজল ? অগত্যা, নিজের জীবনের যা-কিছু সঞ্চয়, তাই দিয়ে ভাড়া নিলেন একটা বাড়ি ২৫নং ডোমতলা লেনে আর তিনমাসের মধ্যেই সেটাকে গড়ে-পিটে নিলেন তিনশো দর্শকের এক নাট্যশালা। নিজের আত্মচরিতে লিখেছেন এইভাবে —

"অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিই নিজের উদ্‌বৃত্ত টাকা দিয়ে নিজের থিয়েটার গড়ার, ২৫ নং ডোমতলা লেনের একটা ভাড়াটে বাড়িতে,

তিনশো জন দর্শকের উপযোগী করে। সেইসঙ্গে আরো সিদ্ধান্ত নিই যে আমাকেই হতে হবে তার স্থপতি, আর নির্দেশক আর কাঠের মিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী থেকে যত রকম মজুর তাদের পরিচালক।"

লেবেদেভের প্রাণপাত পরিশ্রমে সত্যই একদিন শেষ হল নাট্যশালা তৈরির কাজ। লেবেদেভ, বাঙালী সংস্কৃতির অনুরাগী লেবেদেভ, সে নাট্যশালার নাম দিলেন 'বেঙ্গলী থিয়েটার'। গোকুলনাথের সহায়তায় পেয়ে গেলেন তিনজন অভিনেত্রী, দশজন অভিনেতা, শুরু হয়ে গেল রিহার্সাল। লেবেদেভ রিহার্সাল দেখতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন কিছু বন্ধু-বান্ধবকে। তাঁরা মুগ্ধ। য়ূরোপীয়ান স্টাইলের স্টেজে, আঁকা-পর্দার দৃশ্যপটে, মঞ্চের আসবাব, আলোকসম্পাত ইত্যাদির মাঝখানে বাংলাভাষায় অভিনয় করা নাটকের সঙ্গে কলকাতার বাঙালী সমাজের ঘটতে চলেছে সেই প্রথম পরিচয়। ফলে রিহার্সালের খবরটাও ছড়িয়ে পড়ল কানে। ক'দিন পরে ক্যালকাটা গেজেটে বিজ্ঞাপন বেরোল, শিগ্‌গির শুরু হবে নাটক। তার তিন সপ্তাহ পরের বিজ্ঞাপনে জানানো হল দিন ক্ষণ। নাটক দেখতে শুধু শহরের মানুষ নয়, ছুটে এসেছেন গ্রামের অভিজাতরাও। নাট্যশালার দরজার বাইরে উপ্‌চে-পড়া ভিড়। লেবেদেভের সেদিন মনে হয়েছিল তিনশো কেন, আরও তিনগুণ আসন বাড়ালেও ঠাঁই দেওয়া যাবে না বুঝি। নাটক শুরু হল। এবং শেষ। অভিভূত দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন, নাটক এত ছোট কেন? মনের আশ মিটতে-না-মিটতেই শেষ হয়ে গেল যেন। সেদিনের দর্শকদের মধ্যে প্রথম সারিতে হাজির ছিলেন বিচারপতি জন হাইড। তিনি চিরকুট পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, কমেডিটির সবটাই অনুবাদ হয়েছে কিনা। উৎসাহিত লেবেদেভ জানালেন, পরের বারে পূর্ণাঙ্গ নাটকটিই অভিনীত হবে এখানে। দ্বিতীয় দফার অভিনয়ের দিন নাটকটির মধ্যে অদল-বদল ঘটে গেল আরো। মূল নাটকের ঘটনাস্থল ছিল স্পেন। সেটাকে করা হল কলকাতা। প্রথম দিনের অভিনয়ে চরিত্রদের নাম ছিল বিদেশী। দ্বিতীয় দিনে নামকরণ হল এদেশী। আবার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। আবার করতালি ধ্বনির অভ্যর্থনা।

বার বার হুবারের সাফল্যে লেবেদেভের উৎসাহ বেড়ে গেল দ্বিগুণ। গভর্নর জেনারেলের কাছে আবেদন জানালেন, পরের বারে নাটকটিকে অভিনয় করাতে চান একই সঙ্গে ইংরেজি আর বাংলায়। সে আবেদন মঞ্জুরও হল যথাসময়ে। কিন্তু অভিনয় হতে পারল না আর কোনও দিন।

তার কারণ অনেক। যাদের তিনি বিশ্বাস করেছিলেন বন্ধু হিসেবে, তারাই গোপন ষড়যন্ত্রে একদিন সর্বস্বান্ত হওয়ার রাস্তায় টেনে নিয়ে গেল তাঁকে। এমন হতে পারে যে, কলকাতার ইংরেজ-সমাজেরও গোপন সায় ছিল ব্যাপারটার পিছনে। কোথাকার কে এক রুশ এসে তাদের তৈরি কলকাতার হিন্দু-বাঙালী সমাজের কালচার নিয়ে হৈ-চৈ করবে সেটা বরদাস্ত করতে চাইছিল না তাদের রাজকীয় মেজাজ। সুতরাং, যেমন করে পারো জব্দ করো রুশটাকে। লেবেদেভকে মোটা অঙ্কের বানানো ঋণের দায়ে জড়িয়ে, একেবারে সর্বস্বান্ত করে ফেলা হল কৌশলে। আদালতে সুবিচার চেয়েও পেলেন না। এইভাবে দু-বছর কেটে গেল দারিদ্র্যে জরো-জরো হয়ে। তারপর হঠাৎ একদিন গভর্নর জেনারেলের আদেশ-পত্র এসে পৌঁছলো 'লর্ড মারলো' নামের জাহাজের ক্যাপ্টেন উইলিয়ম টম্‌সনের হাতে। লেবেদেভকে সব রকম সাহায্য দিয়ে পৌঁছে দাও ইউরোপ। কিন্তু দুর্ভাগ্য তখন লেবেদেভকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছে যে, জাহাজে উঠেও শান্তি নেই। জাহাজে চাপার দুমাস পরে তাঁকে একদিন নামিয়ে দেওয়া হল আফ্রিকার কেপটাউনে। তিনি তখন ঘোরতর অসুস্থ।

তারপর কীভাবে লণ্ডনে পৌঁছলেন, খ্যাতিলাভ করলেন ভারতবর্ষ বিষয়ে অভিজ্ঞ গ্রন্থকার হিসেবে, নিজের দেশে ফিরে পররাষ্ট্র দপ্তরের সম্মানিত রাজকর্মচারী হয়ে উঠলেন, সে এক রূপকথার মতো কাহিনী। কলকাতায় লেবেদেভ নেই আর। নেই তাই বেঙ্গলী থিয়েটারও। বাংলাদেশের নাট্যআন্দোলনের পুরোধা-পুরুষের অম্লান স্মৃতি কিন্তু রয়ে গেল ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে অক্ষরে।

প্রথম ইংরেজি নাট্যশালা

পলাশীর যুদ্ধ তখনো ঘটেনি। বাকি আছে এক বছর। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা মীরজাফরের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করে সিরাজউদ্দৌলাকে হারাল আর মীরজাফরের প্রিয় অনুচরেরা বন্দী সিরাজকে হত্যা করল নিষ্ঠুর ভাবে। তারপরই ইংরেজরা বাংলাদেশের নবাব। শুরু হয়ে গেল ভারতবর্ষের পরাধীনতা।

অথচ পরাধীন হওয়ার ঐ এক বছর আগে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ছুটে এসেছিলেন কলকাতায়, বেয়াদপ ইংরেজদের শায়েস্তা করতে। সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য। আর সেই রকম কামান বন্দুক। চিৎপুরে পৌঁছে আস্তানা। ইংরেজরা গোড়ার দিকে ভাবতে পারেনি, নবাব সাহস করে এতখানি এগোবেন। কাশিমবাজার কুঠি আক্রমণ করেছেন, তারপর কলকাতার দিকে এগোচ্ছেন খবর পেয়েও তাদের ধারণা ছিল অন্য রকম। বয়সে ছেলেমানুষ। তার উপর ফুর্তিবাজ। ইংরেজদের সঙ্গে সত্যি সত্যি লড়ায়ে নামার মতো বুকের পাটা কি আর আছে নাকি? কিন্তু ইংরেজরা যখন দেখলে সত্যি সত্যিই কামান দাগতে শুরু করে দিয়েছে নবাবের সৈন্যরা, অমনি উঠলো পালাই পালাই রব। যে যেদিকে পারে ঘর সংসার ছেড়ে প্রাণের ভয়ে দৌড়। ইংরেজদের সৈন্য নবাবের চেয়ে অনেক কম। তবুও তারা প্রাণপণ চেষ্টা করল বাধা দেওয়ার। ঝরঝরে কেল্লা ছাড়াও তখনকার কলকাতায় বনেদি পাড়া

লালবাজারে গভর্নর ড্রেক সাহেব, আয়ার সাহেব এই রকম সব আরো বড়ো বড়ো সাহেবের বাড়িতে পড়ল সৈন্যদের ছাউনি। এমন-কি ইংরেজদের প্রথম নাট্যশালা যেটা, নাম ওল্ড প্লে হাউস, বাদ পড়ল না সেটাও। আরে, আরে, এখানে ঢুকছ কেন? এটা যে আমাদের ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো একটাই নাট্যশালা। কে শোনে কার কথা। সৈন্য বা সেনাপতির মনের কথাটা তখন এই রকম, আগে তো বাঁচি প্রাণে, তারপর নাটক, নাট্যশালা। কিন্তু এসবেও শেষরক্ষা হল না। এগোতে এগোতে নবাবের সৈন্যরা দখল করে নিলে 'ওল্ড প্লে হাউস'। সেখানে কামড় বসিয়েই তারা আক্রমণ চালাল কেল্লার উপর। ইংরেজরা হেরে ভূত। বিজয়ী নবাব কেল্লায় ঢুকলেন পালকী চেপে। ইংরেজদের হারিয়ে, মেরে হাড় গুঁড়িয়ে, নবাব যখন কলকাতা থেকে ফিরে যাচ্ছেন মুর্শিদাবাদে, তখন পাল্টে দিয়ে গেলেন কলকাতার নামটাও। দাদু আলীবর্দির স্মৃতিকে মনে রেখে কলকাতার নাম দিলেন আলীনগর।

সিরাজ ফিরে গেছেন। কিন্তু কলকাতার ভাঙা হাড়ে জোড়া লাগানো যাচ্ছে না আর। ইংরেজদের প্রথম নাট্যশালা ওল্ড প্লে হাউস ভেঙে-চুরে একশেষ। ছাইভস্ম মাখা শরীর। যুদ্ধে আর যা ভেঙেছে তা হল সেন্ট অ্যানি চার্চ। সাহেব পাড়ায় কথা উঠল ওল্ড প্লে হাউসকেই তাহলে গড়েপিটে নেওয়া হোক নতুন চার্চ হিসেবে। আবেদনও পাঠানো হল কোর্ট অব ডাইরেকটরদের কাছে। অনুমতিও মিলেছিল। কিন্তু ওল্ড প্লে হাউস শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল একটা নিলামঘর। আর ব্যবসায়ীদের মালপত্র রাখার গুদাম। আঠারো শতকের মাঝামাঝি একটা সময়ে ইংরেজরা তৈরি করেছিল এটা। ঠিক কোন্ বছরে, তার হদিশ দেবার মতো নথিপত্র মেলেনি। আবার নাট্যশালা যে ঠিক কোন্খানে ছিল, তা নিয়েও নানা মুনির নানা মত। তবে লালবাজার অঞ্চলেই যে ছিল তা নিয়ে মতভেদ নেই কারো। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ অভিজাত ইংরেজদের বসবাস তখন ঐখানেই। সে নাট্যশালায় অভিনয় করত অ্যামেচার অভিনেতারাই। আর তাদের প্রেরণা এবং পরামর্শ জোগাতেন ডেভিড

গ্যারিক। গ্যারিক সাহেবের তখন ইংলণ্ডে আকাশ-কাঁপানো খ্যাতি। নিজে কলকাতায় আসেন নি কখনো। সাগরের ওপার থেকেই পাঠিয়ে দিতেন উৎসাহ-উপদেশ। পরে ১৭৭২-এ কলকাতার ইংরেজ অভিনেতারা উপহার হিসেবে তাঁকে পাঠিয়ে দেন ছুটো মেদিরা কাঠের পাইপ।

ওল্ড প্লে হাউস উঠে যাওয়ার পর ১৯ বছর কলকাতায় কোনো নাট্যশালা ছিল না ইংরেজদের। ১৭৭৫-এ আবার শুরু হয়ে গেল তোড়জোড়। ইংরেজদের জন্যে দ্বিতীয় নাট্যশালা গড়ে দিলেন মিঃ উইলিয়ামসন। তিনি ছিলেন কলকাতার একজন নামকরা নীলামদার। ইংরেজ সমাজে তাঁর ডাক নাম ছিল ভেণ্ডু মাস্টার। জায়গাটা ছিল জে. কারলিয়ারের, নতুন চীনেবাজারে। রাইটার্স বিল্ডিং-এর পিছনে লায়ন্স রেঞ্জের উত্তর-পশ্চিম কোণে। নাট্যশালা গড়ার জন্যে চাঁদা তোলা হয়েছিল ইংরেজ মহলে। সম্ভ্রান্ত প্রায় সব ইংরেজই একশো টাকার শেয়ার কিনে অংশীদার হয়েছিলেন সে নাট্যশালার। সে রকম কয়েকজন অংশীদার হলেন হেস্টিংস, রিচার্ড বার্ওয়েল, স্যার এলিজা ইম্পে, চেম্বার্স, হাইড। নতুন নাট্যশালার নাম দেওয়া হল নিউ প্লে হাউস বা ক্যালকাটা থিয়েটার। তৈরি করতে খরচ পড়ল এক লক্ষ টাকা। আবার উৎসাহ ও উপদেশ চাওয়া হল ডেভিড গ্যারিকের কাছে। তিনি অভিনেতা বার্নাড মেসিঙ্ককে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায়। অভিনয়ের দিন নাট্যশালার সামনের রাস্তাটা ভরে যেত পালকী আর ফিটনে। তখন তো বিদ্যুৎ আসে নি, তাই রাস্তাঘাট আলো করা হতো মশালচির হাতের মশালে। বক্সে বসে থিয়েটার দেখতে হলে টিকিটের দাম একটা সোনার মোহর। তা ছাড়া আর সব আট সিক্কা টাকা। এত চড়া দাম, তবু দর্শকের কমতি নেই। ক্যালকাটা থিয়েটারে প্রথম যে নাটক হয় তার নাম— 'Beaux Stratagem'··· তারিখ ১৭৮০-র ২৯ জানুয়ারি।

এইখানেই শ্রীমতী এলিজা ফে দেখেছিলেন 'Venice Preserved' নামের একটা নাটক। কলকাতার থেকে নিজের বোনকে লিখে

পাঠালেন যে-সব চিঠি, তার মধ্যেই রয়েছে ঐ থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতার বিবরণ। চিঠির তারিখ, ২৬ মার্চ, ১৭৮১।

"গভর্নমেণ্টের চিঠিপত্র নিয়ে খুব শিগ্‌গির একটা জাহাজ যাবে ইউরোপে। চিঠি পাঠানোর এই সুযোগটাকে হাতছাড়া করা ঠিক হবে না ভেবেই আমাদের এখানকার থিয়েটার সম্বন্ধে দুটো-চারটে কথা বলে শেষ করব এই চিঠি।

থিয়েটারের বাড়িটা তৈরি করা হয়েছে চাঁদা তুলে। দৃশ্যপট ইত্যাদি সাজানো হয়েছে সুন্দর করে। সাধারণত অ্যামেচাররাই অংশ নিয়ে থাকে অভিনয়ে। পেশাদারদের অভিনয় করতে দেওয়া হয় না। তবুও বলবো এই অ্যামেচার থিয়েটারে যে-সব অভিনয় দেখেছি যে-কোনো ইউরোপীয় স্টেজের অভিনয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায় তার। কিছুদিন আগে দেখেছি Venice Preserved নামে একটা নাটক। সেনাবিভাগের ক্যাপ্‌টেন কল, বোর্ড অব ট্রেড-এর মিস্টার ড্রোজ, আর লেফটেন্যাণ্ট নর্ফার যে তিনটে চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, তা সত্যিই উচ্চাঙ্গের। নর্ফারকে যখন স্টেজের বাইরে দেখি, মনে হয় কি রকম মেয়ে-মুখো। কিন্তু শুনেছি সামরিক অফিসার হিসেবে নাকি দারুণ সাহসী। বাইরে সাজগোজ করে থাকেন এমন যে মনে হবে চলেছেন বল-নাচ নাচতে। অথবা হঠাৎ কাজকর্মে ডাক পড়লে আদৌ কোনো ক্যাবলামি করেন না। জানি না, কি করে ভদ্রলোক এমন পরিপাটি সেজে থাকেন সব সময়। চুলের বাহার দেখলে তো মনে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় আয়নার সামনে।

এই ধরনের অ্যামেচার থিয়েটারের একটা বড় অসুবিধে হল, কেউই পরিচালকের হুকুমে কাজ করতে রাজী নয়। সকলেই স্বাধীন, সকলেই যে-যার ইচ্ছে মতো ভূমিকা চান। ফলে যাকে যেটা মানায় না তিনি সেটা করতে গেলে ট্রাজেডী দেখতে বসে কমেডির মতো হাসতে হয়। তবু বলব, সন্ধেবেলা থিয়েটারে যাওয়ার চেয়ে ভালোভাবে সময় কাটানোর আর কিছু নেই। টাকা-পয়সার টানাটানি না পড়লে আমি

কোনো নাটক দেখাই বাদ দিতাম না। প্রবেশ দক্ষিণা একটা করে স্বর্ণমোহর। কয়েক ঘণ্টার আমোদের জন্যে এতটা দাম দেওয়া অসম্ভব।"

উইলিয়াম হিকি নামে একজন সাহেব তাঁর ভারতবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে চারখণ্ডে লিখেছিলেন নিজের স্মৃতিকথা। তার মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়েই কলকাতা। কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে অ্যাটর্নি হিসেবে পসার জমাতেই মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় আসেন। ১৭৭৭ থেকে ১৮০৯ পর্যন্ত ছিলেন কলকাতায়। মাঝে স্বদেশে গিয়েছিলেন মাত্র দুবার। যেহেতু দীর্ঘ সময় জুড়ে এখানেই বসবাস, তাই কলকাতার নানা দিকের নানা কথা ঠাঁই পেয়েছে তাঁর স্মৃতিকথায়। এমন-কি তখনকার থিয়েটারের ঘটনাও। সেখান থেকেই এখন শুনবো ফ্রান্সিস র্যাণ্ডেল নামের এক ভদ্রলোকের কাহিনী।

"১৭৮৩-তে বাংলাদেশে ফিরে আসার পর ফ্রান্সিস র্যাণ্ডেল নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। যখন বিলেতে ছিলাম, র্যাণ্ডেল তখন কোম্পানির অ্যাসিস্টান্ট সার্জেন হয়ে কলকাতায় আসেন। বয়স বছর পঁচিশ। কিন্তু দেখলে মনে হয় বয়সটা দুগুণ বুঝি। এমন লম্বা-চওড়া চেহারা। সুন্দর মুখশ্রী। টানা টানা চোখ। গম্ভীর আওয়াজ গলায়। চোখের চাউনি দিয়ে মনের সব কথাই বলতে পারেন চমৎকার। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত অভিনেতা গ্যারিককেও হার মানিয়ে দিতে পারে। তার গলার গম্ভীর আওয়াজের মধ্যেও রয়েছে এক ধরনের মিষ্টি সুর, যা মন কাড়ে। সব দেখে শুনে মনে হয় যেন অভিনয় করার জন্যেই জন্ম। কথাটা তারও মনে হতে লাগল ধীরে ধীরে। অবশ্য ইংলণ্ডে থাকার সময় অ্যামেচার থিয়েটারে অভিনয় করে নাম হয়েছিল এক সময়। কিন্তু বাড়ির লোকের আপত্তিতে অভিনয়ের পেশায় না গিয়ে সার্জারি পড়তে যান।

র্যাণ্ডেল যখন কলকাতায়, তখন শহরে একটা বড় পাবলিক থিয়েটার সকলে চাঁদা দিয়ে চালাতেন। কিন্তু সেখানে সকলেই চায়

নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতে। সকলেই নিজেকে মনে করে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। তাই দিয়ে ঝগড়াঝাঁটি এতদূর গড়াল যে শেষ পর্যন্ত ডুয়েল-লড়াই। তার ফলে এমন হল যে অভিনয়ের জন্যে অভিনেতা পাওয়াই দুষ্কর। নাটক বন্ধ। ওদিকে নাটকের সাজপোশাক তৈরি করতে গিয়ে থিয়েটারের দেনা হয়ে গেছে হাজার ত্রিশের মতো টাকা। এই সময়েই র‍্যাণ্ডেল এসে থিয়েটারের মালিকদের জানালে যে থিয়েটার চালানোর সমস্ত দায়িত্ব নিতে রাজী। নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এই চার মাসে সপ্তাহে একটা করে নতুন নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারবো। রাজী হয়ে গেল কর্তৃপক্ষ।

র‍্যাণ্ডেলের পরিচালনায় সত্যি সত্যি উন্নতি হতে লাগল অভিনয়ের। তাঁর বিচারবুদ্ধিকে মান্য করতো সকলেই। দেখতে দেখতে দর্শকও বাড়ল থিয়েটারের। অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল দেনা। লাভের অংশ সবটাই নিজে না নিয়ে ভাগ করে দিতেন সহকর্মীদের মধ্যে। আর অভিনয়ের শেষে খাওয়াতেন সহ-অভিনেতাদের।

একবার উইলিয়ম বার্ক এসেছেন তাঁর অভিনয়ে হ্যামলেট দেখতে। দেখে মন্তব্য করলেন, গ্যারিকের সমকক্ষ বলতে দ্বিধা নেই। হ্যামলেট ছাড়া কিং লিয়ার, ওথেলো, রিচার্ড দি থার্ড-এও দেখিয়ে ছিলেন নিজের ক্ষমতা। তবে আমার ধারণা ওথেলোয় উঠতে পারেনি গ্যারিকের উপরে।

তখনকার থিয়েটারে মহিলা অভিনেত্রী পাওয়া যেত না। পুরুষরাই সাজতো নারী। মিঃ ব্লাইড আর মিঃ নর্ফার নামে দুজন খুব নাম কিনেছিলেন মহিলা চরিত্রের অভিনয়ে। র‍্যাণ্ডেল ইংল্যাণ্ড থেকে নিয়ে এলেন কয়েকজন অভিনেত্রী। সেই সঙ্গে পুরুষ অভিনেতাও। হৈ-চৈ পড়ে গেল সারা শহরে।”

কলকাতার সাহেব পাড়ার আদি যুগের থিয়েটারের হামাগুড়ির দিন শেষ হয়ে হাঁটি হাঁটি পা-য়ে এগোনো শুরু হয়ে গেল এরপর।

বাঙালার প্রথম থিয়েটার

লেবেদেভ নেই কলকাতায়। তাই থিয়েটারও নেই কলকাতায়। কিন্তু দিনে দিনে বাড়ন্ত একটা শহর কি শুধু খেয়ে-ঘুমিয়ে আর চাকরী করে দিন কাটাবে নাকি? কলকাতায় ইস্কুল হচ্ছে, কলেজ হচ্ছে, জনহিতকর কাজকর্মও হচ্ছে কত রকম, কিন্তু আমোদে-প্রমোদে দুদণ্ড সময় কাটাবার মতো একটা নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হল না এতদিনেও। এই ক্ষোভ মন থেকে ছড়াল লোকের মুখে মুখে। সেখান থেকে খবরের কাগজের পাতায়। কাগজের নাম সমাচার চন্দ্রিকা। হঠাৎ একদিন সম্পাদকীয় লিখে বসল কাগজে। কলকাতা ধনী আর সম্ভ্রান্ত মানুষদের কাছে আবেদন জানালে, ইংরেজরা যে ভাবে শেয়ার কিনে নাট্যশালা বানিয়েছে নিজেদের, সেটা করতে এগিয়ে আসছেন না কেন কেউই?

সম্পাদকীয়টা লেখা হয়েছিল ১৮২৬-এ। বাঙালী সমাজের কাছ থেকে সাড়া পেতে সময় লেগে গেল আরও পাঁচ বছর। সাড়া দিলেন পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়ির গোপীমোহন ঠাকুরের ছোট ছেলে প্রসন্নকুমার ঠাকুর। নিজের বাড়িতে ডাকলেন মিটিং। আলোচ্য বিষয়, কলকাতায় একটা ইংরেজি ধরনের নাট্যশালা গড়ে তোলা যাবে কি যাবে না। এরকম প্রশ্ন তোলার কারণ ছিল একটাই। কলকাতার ধনীবাবুদের রুচি তখন খেউড়, তরজা, কবিগান, যাত্রা আর বুলবুলির লড়ায়ে। নাটক হলো কি হলো না সেটা তাঁদের মাথা ব্যথার বিষয় নয়। মাথা

যারা ঘামায় তারা হয় গোনাগুণতি শিক্ষিত, নয় সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ।

প্রসন্ন ঠাকুরের বাড়ির সভায় সেদিন যাঁরা হাজির, তাঁরা সকলেই শহরের শিক্ষিত মানুষ। সভায় সেইদিনই গড়ে তোলা একটা সংস্থা, যার নাম 'হিন্দু থিয়েট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন'। সভায় ঠিক হলো, এই অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে কলকাতায় তৈরি হবে একটা নাট্যশালা। নাম হবে হিন্দু থিয়েটার। তবে অভিনয় হবে ইংরেজি ভাষার নাটক। আর অভিনয়ের ধরন-ধারণ সবই ইংরেজি নাটকের মতো। এরপর এল নাটক বাছায়ের পালা। কী নাটক? সভা ঠিক করলে, নাটক হবে ভবভূতির উত্তররামচরিত। কিন্তু সে তো সংস্কৃতে লেখা। সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করবে কে? প্রসন্ন ঠাকুর জানালেন, এ নিয়ে ভাববার কিছু নেই। উইলসন সাহেবকে অনুরোধ জানালেই রাজী হয়ে যাবেন।

উইলসন মানে হোরেস হেম্যান উইলসন। ভারততত্ত্ববিদ নামে খ্যাত। ১৮০৮। উইলসন কলকাতায় বাইশ-তেইশ বছর বয়সে। বছর তিনেকের মধ্যেই এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক। প্রায় চব্বিশ বছর কলকাতা টাঁকশালের অ্যাসে মাস্টার। এরই ফাঁকে ফাঁকে শিখেছেন সংস্কৃত। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি নিয়ে চালিয়েছেন পড়াশোনা, গবেষণা। কালিদাসের মেঘদূতকে অনুবাদ করেছেন ইংরেজিতে। সংস্কৃত নাটক আর নাট্যতত্ত্ব নিয়ে যখন কথা বলেন, মনে হয় ভারতীয় পণ্ডিত। প্রসন্নকুমারের সঙ্গে পরিচয় ছিল উইলসনের। গিয়ে ধরলেন, উত্তর রামচরিত আপনাকে অনুবাদ করে দিতে হবে ইংরেজিতে। উইলসনের মুখে না নেই। শুধু অনুবাদই করে দিলেন না। নাটকের পরিচালনার ব্যাপারেও ঘাড় পেতে নিলেন পুরো দায়িত্ব। তবে আসল অভিনয়ের দিন দেখা গেল একদিকে যেমন উত্তররামচরিতের সমস্তটার বদলে অভিনয় করা হয়েছে অংশবিশেষ, তেমনি নাটকের পুরো সময়টাকে ভরাবার জন্যে তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল শেকস্‌পীয়রের জুলিয়াস সীজার নাটকের পঞ্চম অংশটা।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর বড়লোকের বাড়ির ছেলে। নিজেও ব্যারিস্টারী করে বড়লোক। দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগ। নাটক বা নাট্যশালা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছুদিন আগেই বের করেছেন একটা ইংরেজি পত্রিকা, 'দা রিফরমার'। সুতরাং নাটকের জন্যে তিনি যে দরাজ হাতেই খরচ করবেন তাতে সন্দেহ থাকার কথা নয়। নাটকের মঞ্চ তৈরি হল তাঁর বেলেঘাটায় শুঁড়োর বাগানবাড়িতে। অভিনয়ের দিন শুঁড়োর বাগানবাড়িতে তিল ধারণের জায়গা নেই। টিকিট কেটে দেখার থিয়েটার নয় সেটা। এসেছেন শুধু আমন্ত্রিত অতিথিরাই। অর্থাৎ রাজা-রাজড়া, জমিদার আর বড় বড় রাজকর্মচারী সাহেব। তাদেরই মধ্যে তিনজন দর্শক ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিস স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, কর্নেল ইয়ং, আর রাজা রাধাকান্ত দেব।

অভিনয় হলো এক রকম ভালোই। কিন্তু মজার ব্যাপার তা নিয়ে দু পক্ষের কাগজ মন্তব্য করল দু-রকমের। কেউই প্রসন্নকুমারের এই উদ্যমের সম্পর্কে প্রসন্ন নয়। ইংরেজি কাগজের ঘোরতর আপত্তি, হিন্দু বা বাঙালীরা কেন ইংরেজিতে নাটক অভিনয় করবে? কে তাদের এতখানি সাহস জোগাল ইংরেজি ভাষার সেরা রচনাকে এভাবে খুন করার? এ তো বিদেশী আচার-আচরণকে ভেঙচানোর মতো।

একজন ইংরেজ লেখক পরামর্শ দিলে আরো রেগে গিয়ে— হিন্দুরা বরং নিজেদের কলমে নিজেদের দেশী ঘটনাকে নিয়ে ট্রাজেডি, কমেডি, ফার্স যা ইচ্ছে লিখে অভিনয় করুক। যাদের গায়ের রঙ অন্য রকম তারা কেন ইংরেজি নাটকের চরিত্র নিয়ে অভিনয় করতে আসে?

অন্যদিকে বাংলা কাগজের আপত্তি আরেক রকমের। সমাচার চন্দ্রিকায় প্রসন্নকুমারের নাটকের খবর ছাপা হওয়ার পরে জনৈক পাঠক ঐ কাগজে চিঠি লিখে জানালে—

"শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর উত্তররামচরিত্র ইঙ্গরেজী ভাষায় যে যাত্রা করিয়াছেন সে সম্বাদ চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাড়িতে গত ৩ মাস মাঘ রবিবার বুলবুল লড়াই

হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করেন নাই ইহার কারণ কি সে যাহা হউক গত ৯ মাঘ শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুত বাবু রামমোহন মল্লিকের মেছুয়াবাজারের বাটীতে বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুত মোহন চাঁদ বাবু এবং জোড়াসাঁকোস্থ শ্রীযুত কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় দিগের উভয় দলে আখড়া সংগীতের যে সংগ্রাম হইয়াছিল তাহা পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন কিনা যদি প্রকাশ করেন তবে জয়পরাজয় লিখিয়া দিবেন।"

এই চিঠিই বলে দিচ্ছে তখন কলকাতায় বাঙালী পাড়ায় বুলবুলির লড়াই আর আখড়া গানের আসরের কদর ছিল কতখানি। আরও একটা মজার ব্যাপার পত্রলেখক নাটককেও লিখেছেন যাত্রা। এতেই বোঝা যায় তখনো পর্যন্ত কলকাতার বাঙালী সমাজ নাটকের স্বাতন্ত্র্য ধরন সম্পর্কে একেবারেই ধারণাহীন।

উত্তররামচরিতের তিনমাস পরে হিন্দু থিয়েটারে আবার যে নাটকের অভিনয় হল, সেটা কিন্তু একটা প্রহসন। নাম, 'নাথিং সুপার ফ্লুয়েন্স'। একটা তুর্কি কাহিনীকে অবলম্বন করে ইংরেজিতে লেখা ফার্স।

ব্যাস, ঐ নাটকের পরই হিন্দু থিয়েটারের পতন।

আসলে পতন হওয়ার কারণও ছিল অনেক। শুধু ইংরেজ আর গোনাগুনতি শিক্ষিত বাঙালীর উপর নির্ভর করে তো নাটক চালানো যায় না। সাধারণ বাঙালী সমাজ নাটক সম্পর্কে তখনো পুরোপুরি উদাসীন। ওদিকে হিন্দু থিয়েটারেরও দর্শকের বসবার আসন সংখ্যা খুবই কম। তার উপরে ইংরেজিতে যে-সব নাটকের অভিনয় হচ্ছিল সেটা না সাহেব না বাঙালী, খুশী করতে পারেনি কাউকেই।

এখানে একটা লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার হল, নাটকের ভাষা। লেবেদেভ নামের বিদেশী এসে চেষ্টা করল বাংলা ভাষায় নাটকের অভিনয় করতে। আর বাঙালীর উদ্যোগে যখন নাটকের অভিনয় হচ্ছে, তখন তার ভাষাটা হয়ে গেল ইংরেজি। যে সময়ের কথা অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকেও কলকাতার শিক্ষিত বাঙালী সমাজ ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজি আদব-কায়দা আর ইংরেজের কাছ থেকে খাতির

পাওয়ার দিকে কতখানি ঝুঁকেছিল, তার প্রমাণ মিলবে এ থেকে। এর পরে আর একজন বাঙালী বাবু এগিয়ে এসেছিলেন বাংলা নাট্যশালা গড়তে। এখন যেখানে শ্যামবাজারের ট্রাম ডিপো সেখানেই ছিল তাঁর নাট্যশালা। নবীনচন্দ্রের নাট্যশালায় প্রথম অভিনয় হয়েছিল ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জোগাড় করে-ছিলেন যাত্রা থেকে। প্রথম দিনের অভিনয়ে হিন্দু, মুসলমান আর সাহেব-সুবো মিলিয়ে হাজির ছিলেন হাজার খানেকের বেশি দর্শক, পুরনো কাগজ ঘেঁটে পাওয়া যায় একরকম খবর। অভিনয় শুরু হয়েছিল রাত বারোটার একটু আগে। শেষ হয়েছিল ভোর সাড়ে ছ-টায়।

এই নাটককে পুরোপুরি বাস্তবের চেহারা দিতে অঢেল টাকা খরচ করেছিলেন নবীনচন্দ্র। নাটকের সঙ্গে ছিল দেশী বাজনাদারের দল। মঞ্চের উপরেই ঝড় বিদ্যুৎ দেখানোর জন্যে তিনি নাকি ইংলণ্ড থেকে অনেক টাকা খরচ করে আনিয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক উপকরণ। কিন্তু তার চেয়েও যেটা অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার, সেটা হল এই নাটকের বিভিন্ন দৃশ্য অভিনয় হয়েছিল বিভিন্ন জায়গায়। যেমন যে জায়গায় সুন্দর বসে আছে দিঘির পাড়ের বকুল গাছের তলায়, সে দৃশ্যটার অভিনয় হয়েছিল নবীনবাবুর বাড়ির পুকুরের পাশে। আবার মালিনী মাসির কুঁড়েঘরটা অন্য জায়গায়। সে দৃশ্যের অভিনয় দেখার জন্যে দর্শকদের উঠে যেতে হতো সেখানে। নবীনচন্দ্রের নিজের বৈঠক-খানাটাকে বানানো হয়েছিল বর্ধমান রাজার বাড়ি। আবার মালিনীর ঘর থেকে বর্ধমান রাজার রাজবাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার দৃশ্যটাকে মূল কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে বাস্তব চেহারা দিতে সত্যি সত্যিই খোঁড়া হয়েছিল লম্বা একটা সুড়ঙ্গ।

ব্যাপারটা খুবই উপভোগ করার তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এভাবে নাটকের নামে মজা করাটাকে সফল করা যায় যতখানি, সত্যিকারের নাটক বা নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলা যায় তার চেয়ে ঢের কম। ফলে

নবীনচন্দ্রের এক রাশ টাকা জলেই গেল শেষ পর্যন্ত। সত্যিকারের নাটক বা নাট্যশালা গড়ে উঠতে লাগলো আরো বেশ কয়েকটা বছর। যদিও এলোমেলোভাবে আজ আশুতোষ দেবের বাড়িতে, কাল ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রাক্তন ছাত্রদের উৎসাহে, কদিন পরে ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে তাঁর বেলগাছিয়ার বাড়িতে আবার কখনো কালীপ্রসন্ন সিংহের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কখনো বাংলা, কখনো ইংরেজি নানান নাটক নিয়ে পরীক্ষা চলল অনেক। তাতে অবশ্য লাভ কম হয়নি। বেলগাছিয়ার নাট্যশালা না হলে আমরা কোনদিন কবি মাইকেল মধুসূদনকে এত কাছে পেতাম না নাট্যকার হিসেবে।

প্রথম উপন্যাস

বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাসের জন্ম আজ থেকে ১০০ বছরেরও বেশী আগে। ১৮৫৮ সালে। যিনি জন্মদাতা তাঁর নাম ঠেকচাঁদ ঠাকুর। আসলে ওটা কিন্তু ছদ্মনাম। আসল নাম হল প্যারীচাঁদ মিত্র। রাম-নারায়ণ মিত্রের ছেলে। তিনি যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র তখন কলকাতার 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে একটা দল তৈরি হয়েছিল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত টিকি নেড়ে যে-সব নিয়ম নিষ্ঠা, মানা-না-মানার কথা বাতলে দেন, এরা তার একটাকেও মানতে রাজী নয়। এরা সবাই হেনরী ডিরোজিওর ছাত্র। তাঁর কাছ থেকে এই দল দীক্ষা নিয়েছে সমাজটা বদলানোর নতুন মন্ত্রে। এই দলের সভ্যরা পরবর্তী কালে সকলেই প্রায় বিখ্যাত হয়েছেন। কেউ বিদ্যা-বুদ্ধিতে, কেউ সমাজ-সেবায়, কেউ অন্যান্য কাজে। বাগ্মী ও পণ্ডিত রামগোপাল ঘোষ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, রাধানাথ শিকদার, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইত্যাদিরা ছিলেন এই দলের সভ্য। বড় হয়ে এঁদের কীর্তির অনেক খবরই তোমরা শুনবে। প্যারীচাঁদও ছিলেন এই দলের একজন।

যে সময়ের কথা, তখন বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত শব্দের খুব আধিপত্য। আজকের মতো এমন সহজ-সরল ছিল না তখনকার ভাষা। আর ছিল না মেয়েদের লেখাপড়া শেখার চল। 'ইয়ং বেঙ্গল' ছিল স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষে।

এই নিয়ে জোর লড়াই চলেছে সমাজের রক্ষণশীল মাথা-মাতব্বরদের সঙ্গে। এমনি একটা সময়ে রাধানাথ শিকদারের মাথায় ঢুকল, একটা কাগজ বের করবেন। মাসিক পত্রিকা। আর সে কাগজের ভাষা হবে জলের মতো সরল। এমন সরল যে মেয়েরাও পড়তে পারবে গড়গড়িয়ে। রাধানাথ বলতেন 'যে ভাষা স্ত্রীলোকে বুঝতে না পারে, সে আবার বাঙ্গলা কি ?'

কাগজ তো বেরোবে, লিখবে কে ? ডাক পড়লো বন্ধু প্যারীচাঁদের। প্যারি, আমি একটা কাগজ বের করবো তোমাকেও সম্পাদক হতে হবে আমার সঙ্গে। আর সেই সঙ্গে ধরতে হবে কলম। লিখতে হবে গল্প উপন্যাস, যা পারো। প্যারীচাঁদ শুনে অবাক। কলম ? সাহিত্য ? বল কি ? আমি কী করে পারবো ? রাধানাথ নাছোড়বান্দা। দুই বন্ধুর যুগল সম্পাদনায় যে কাগজ শেষ পর্যন্ত সত্যিই বেরোল তার নাম 'মাসিক পত্রিকা'। আর ঐ পত্রিকাতেই প্যারীচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে ধারাবাহিক ভাবে লিখলেন এক সামাজিক উপন্যাস। নাম 'আলালের ঘরের দুলাল'। সে লেখা বেরোনো মাত্রই কলকাতা জুড়ে হৈ-চৈ। কী অপূর্ব রচনা। নিজেদের কালের ঘটনা নিয়ে, নিজেদের মুখের ভাষায় এমন লেখা যে হতে পারে, কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি তখন। রাতারাতি এই ভাষার নাম হয়ে গেল 'আলালী ভাষা'। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বইয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী এই সময়ের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন—

"সে সময়ে পাঁচজন ইংরাজী শিক্ষিত লোক কলিকাতার কোনও বৈঠকখানাতে একত্র বসিলেই এই সংস্কৃত-বহুল ভাষা লইয়া অনেক হাসাহাসি হইত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'-এর ন্যায় পত্রেও সেই উপহাস বিদ্রূপ প্রকাশিত হইত। অক্ষয়বাবু যখন সংস্কৃতকে আশ্রয় করিয়া 'জিগীষা' 'জিজীবিষা' প্রভৃতি শব্দ প্রণয়ন করিলেন, তখন আমরা কলিকাতার যে কোনও শিক্ষিত লোকের বাটীতে যাইতাম, শুনিতে পাইতাম 'জিগীষা' 'জিজীবিষা' প্রভৃতি শব্দের সহিত 'চিট্‌টীমিষা' শব্দ যোগ করিয়া হাসাহাসি হইতেছে।"

'আলালের ঘরের দুলাল' নিয়ে যখন ঘরে ঘরে আলোচনা, রাধানাথের মনে সেদিন কী আনন্দ। নিজের কাগজে যে-সব লেখা বেরোতো, তিনি পড়ে শোনাতেন বাড়ির মেয়েদের। তাদের আশা মিটতো না মনের। রাত পেরিয়ে ভোর হতে-না-হতেই ছুটে যেতেন বন্ধুর বাড়ি। 'প্যারি, প্যারি, ওঠো। এবারের পত্রিকা পড়ে তোমার স্ত্রী কি বললেন বলো।' এই বলে চেঁচিয়ে ঘুম ভাঙাতেন রাধানাথ।

বাংলা ভাষায় আমরা সাহিত্য সম্রাট বলি, সেই বঙ্কিমচন্দ্র প্যারী-চাঁদের এই উপন্যাসের গলায় প্রশংসার মালা পরিয়ে দিয়ে লিখেছিলেন, "তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে— তাহার জন্য ইংরেজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথমে দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে, তেমনিই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধহয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাংলা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাংলা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল'।

প্রথম ইংরেজী স্কুল

আমাদের দেশে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার পিছনে যেমন বেথুন সাহেবের উৎসাহ-উদ্দীপনা, ইংরেজী ভাষায় এদেশের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার পিছনে তেমনি অবদান ডেভিড হেয়ারের। ডেভিড হেয়ারের নাম জানে না, তেমন লোক বিরল। নামেই যা বিদেশী। মানুষ হিসেবে আমাদের যেন আপনজন। হেয়ার স্কুল তাঁরই নামে নাম। সাহেবের স্কুল। কিন্তু কোনদিন কোনো সাহেব সে স্কুলের শিক্ষক হয়নি। এর জন্যে কম বাধা-বিপত্তি সইতে হয়নি তাঁকে। তবু নিজের সংকল্পে তিনি অটল। হেয়ার স্কুলের জন্ম সাল ১৮২৩। ঠনঠনের কাছে আরপুলিতে তাঁর নিজের হাতে গড়া একটা পাঠশালা, তার ছিল দুটো বিভাগ। একটা বাংলা। আরেকটা ইংরেজী। গোলদিঘীর কাছে পটলডাঙায় নতুন তৈরি হলো আর একটা স্কুল। স্কুল বুক সোসাইটি এর পরিচালক। ডেভিড হেয়ার নিজের পকেট থেকে খরচ করতেন বেশ কিছু টাকা, যাতে স্কুলটা দাঁড়ায়। এই স্কুল থেকে ভাল ভাল ছাত্রদের পাঠানো হতো হিন্দু কলেজে। আরো অন্যান্য স্কুল থেকেও, যে-সব স্কুল সোসাইটির পরিচালনায় চলে, ছাত্র আসতো। তখনকার নিয়মমত বছরে মোট ৩০ জন ছাত্রকে মাসোহারা দেওয়া হতো। শেষ পর্যন্ত দেখা যেত হেয়ার সাহেবের স্কুলের ছাত্ররাই ঐ ৩০ জনের মধ্যে সংখ্যায় বেশী। সেকালের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিই ঐ হেয়ার স্কুলের ছাত্র। যেমন

ধরো কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু, মহেন্দ্রলাল সরকার, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত ইত্যাদি। প্রসিদ্ধ বাগ্মী রাজনৈতিক নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

'হেয়ার স্কুল' গোড়া থেকেই হেয়ার স্কুল ছিল না। কখনো নাম ছিল 'ব্রাঞ্চ স্কুল' কখনো 'হিন্দু কলেজ ব্রাঞ্চ স্কুল', কখনো বা 'স্কুল সোসাইটির স্কুল'। হিন্দু কলেজ দু'ভাগ হয়ে যায় ১৮৫৪ সালে। একটা ভাগ হয় প্রেসিডেন্সী কলেজ। আরেকটা হিন্দু স্কুল। প্যারীচরণ সরকার তখন এর প্রধান শিক্ষক। তিনিই নতুন করে নাম দিলেন হেয়ার স্কুল।

এবার ঐ স্কুলেরই একজন প্রাক্তন এবং প্রখ্যাত ছাত্র রাজনারায়ণ বসুর জবানীতে শোনা যাক হেয়ার স্কুলের ইতিহাস :

"হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে যখন আমি পড়ি, তখন আমাদিগের তিনজন শিক্ষক ছিলেন। একজনের নাম দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর একজনের নাম উমাচরণ মিত্র, তৃতীয়ের নাম রাধামাধব দে।··· উমাচরণ আমাদিগের নিকট স্কটের 'আইভান হো', পোপের 'পোয়েমস', গ্রিয়রের 'হেনরি টু এমা' এবং অন্যান্য গদ্য পদ্য কাব্য আমাদিগের নিকট উত্তমরূপে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়ে আমাদিগের মনে ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দিয়াছিলেন।···রাধামাধববাবু গণিত শিখাইতেন। চিরকালই আমি গণিত বিদ্বেষী। গণিতের পুস্তক দেখিলে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইত। এই রোগকে গণিতাঙ্ক রোগ বলা যাইতে পারে। উহা জলাতঙ্ক রোগের ন্যায়।···হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময় আমি হস্তযন্ত্রে মুদ্রিত একটি সংবাদপত্র প্রতি সোমবার বাহির করিতাম। উহা সমস্ত হাতে লিখিয়া বাহির করিতাম। সংবাদপত্রে সংবাদ, সম্পাদকীয় উক্তি ও প্রেরিত পত্র থাকিত, উহাতেও সেইরূপ দস্তুর মোতাবেক থাকিত।···

ইংরেজী ১৮৪০ সালে আমি হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে হিন্দু

কলেজে ভর্তি হই। তখন মধ্যে মধ্যে হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে বালকগণ হিন্দু কলেজে ফ্রি ভর্তি হইত। হেয়ার সাহেব বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার পিতা বলিয়া তাঁহার সম্মানার্থে কলেজের অধ্যাপকেরা ইহাদিগের নিকট হইতে বেতন লইতেন না। এই সকল বালকদিগকে হিন্দু কলেজের ছোকরারা 'বড়ে' বলিত।"

শুধু যে স্কুল গড়েই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন তা নয়। তাঁকে বলা হয় হিন্দু কলেজেরও আদি-কল্পনাকার।

প্রথম মেয়েদের স্কুল

পুরো নাম ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন। ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৮৪৮-এ। বড়-লাটের শাসন পরিষদের আইন সচিব। সেই সঙ্গে শিক্ষা বিভাগের সভাপতি। একবার বারাসতে গেছেন একটা বালিকা বিদ্যালয় দেখতে। ফিরে এসে মনের মধ্যে তুমুল আলোড়ন। কলকাতা, এত বড় একটা শহর। এখানে মেয়েদের জন্যে একটা স্কুল হবে না? রামগোপাল ঘোষ, সেকালের একজন বিখ্যাত বাগ্মী এবং সমাজ-সংস্কারক। তিনিও এডুকেশন কাউন্সিলের সদস্য। বেথুন সাহেবের মনের গোপন বাসনার কথাটা খুলে বললেন তাঁর কাছে। রামগোপাল সব শুনে বললেন, দাঁড়াও কী করা যায় দেখছি।

সমাজের হোমরা-চোমরা মানুষ, অথচ মেয়েদের লেখাপড়ার নামে চোখ চড়কগাছে উঠবে না, তিনি নিজের সেই বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে এক সভা বসালেন বেথুনের বাড়িতে। বেথুন সেই সভায় বুকের বাসনাকে মুখের ভাষায় প্রকাশ করলেন সকলের কাছে। শুনে সকলেই খুশী। এ তো খুবই সাধু প্রস্তাব। শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সমাজের যে-কোন রকম সনাতনী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা কিছু করার ব্যাপারে দক্ষিণারঞ্জনের পা এগিয়েই আছে। তিনি বললেন, কী চাই? বাড়ি? সুকিয়া স্ট্রীটে আমার বৈঠকখানা রয়েছে। এক পয়সা ভাড়া লাগবে না। ছেড়ে দিচ্ছি। স্কুল বসিয়ে ফেলো। তা

ছাড়া ওখানে একটা লাইব্রেরী আছে। সেটাও কাজে লাগবে। এখন তো এইভাবে চলুক। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের স্কুল বাড়ি তৈরি করার কথাটাও যেন থেমে না থাকে। মির্জাপুরে পাঁচ বিঘে জমি দিয়ে দিচ্ছি। সেখানেই স্কুল বাড়ি উঠুক।

১৮৪৯-এর ৭ই মে। দক্ষিণারঞ্জনের বৈঠকখানায় বসে গেল কলকাতার মেয়েদের স্কুল। প্রথম দিনের ছাত্রীসংখ্যা ২১। তার মধ্যে দুজনের নাম ভুবনমালা ও কুন্দমালা। এরা দুজনেই পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মেয়ে। শহরের সব শিক্ষিত মানুষই যে এই স্কুলের ব্যাপারটাকে এগিয়ে এসে সম্বর্ধনা জানাল, তা কিন্তু নয়। অনেকে সমর্থন জানিয়েও দূরে সরে গেলেন। যেমন রাধাকান্ত দেব। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। কিন্তু সেটাকে প্রকাশ্য রাজপথে টেনে আনার পক্ষে নন।

বিদ্যাসাগর শুরু থেকেই বেথুন সাহেবের এই উদ্যোগের সহযোগী। বেথুন সাহেব যেদিন এসে অনুরোধ জানালেন, আপনাকেই সম্পাদক হতে হবে এই প্রতিষ্ঠানের, বিদ্যাসাগর এক কথায় রাজী।

মেয়েদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসার জন্যে বেথুন ব্যবস্থা করলেন গাড়ীর। বিদ্যাসাগর নিজের দেশের হালচাল জানতেন। তিনি বুদ্ধি খাটিয়ে সেই গাড়ীর গায়ে লিখিয়ে নিলেন সংস্কৃত-শ্লোক।

কন্যাপবেৎ প্যলনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ

শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামে একটা বিখ্যাত বই আছে। সেটা প্রায় সে-যুগের দলিল। তাতে এই মেয়েদের স্কুল নিয়ে সমাজে যে কানাকানি চলতো তার একটা মজার বর্ণনা আছে। "লোকে বলিতে লাগিল, 'এইবার কলির যা বাকি ছিল, হইয়া গেল। মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি থাকবে না।' নাটুকে রামনারায়ণ রসিকতা করিয়া বাবুদের মজলিসে বলিতে লাগিলেন, 'বাপরে বাপ, মেয়েছেলেকে লেখাপড়া শেখালে কি আর রক্ষা আছে! এক 'আন' শিখাইয়াই রক্ষা নাই। চাল আন,

ডাল আন, কাপড় আন করিয়াই অস্থির করে, অন্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে।' লোকে শুনিয়া হাহা করিয়া এক গাল হাসিতে লাগিল।"

দক্ষিণারঞ্জন মির্জাপুরে জমি দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন মির্জাপুর ছিল কলকাতার উপকণ্ঠ। লোকজনের বসতি নেই। অত দূরে নির্জন জায়গায় মেয়েদের পক্ষে আসা-যাওয়াটা অনেকের পছন্দ হলো না। তখন জমি কেনা হল হেদুয়ার পশ্চিম পাড়ে।

১৮৫০। নভেম্বরের ৬ তারিখ। সেদিন ভিত্তি-পাথর স্থাপন করা হল বেথুন স্কুলের। সেটা স্থাপন করলেন তখনকার ডেপুটি গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট লিটলার। তাঁর স্ত্রী লেডী লিটলার বেথুন সাহেবের অনুরোধে রোপণ করলেন একটা অশোক গাছ। নারী জাতির প্রগতির প্রতীক।

প্রথম মেলা

আজকাল কলকাতায় কত রকমের মেলা হয়। কলকাতায় এই মেলা জিনিসটার প্রথম পত্তন করলেন যিনি তাঁর নাম আগে একবার বলেছি। নবগোপাল মিত্র। তাঁর ভারী ইচ্ছে, একটা মেলার সূত্রে গোটা জাতিকে এক করে তোলা। হাড়ে-মাপে একটা স্বদেশী মানুষ। তাঁর যা কিছু ভাবনা সব স্বদেশীয়ানাকে কেন্দ্র করে। বাঙালী ছেলেদের নিয়ে ভলেন্টিয়ার বাহিনী করতে হবে, তাহলে বাঙালীর ছেলেরাও বীরের মতো যোগ দিতে পারবে সেনাদলে, এই ভাবনা প্রথম মাথায় আসে নবগোপাল মিত্রেরই। এর জন্যে চাই ভাল স্বাস্থ্য। তাই খুলে বসলেন স্বাস্থ্যচর্চার আখড়া। এবং এই উদ্যোগের জন্যে তাঁকে বলা হয়ে থাকে 'ফাদার অব ফিসিক্যাল এডুকেশন'। এ তো গেল শরীরের দিক। এ ছাড়া চাই মনের উন্নতি। তার জন্যে দরকার জাতীয় মেলা, জাতীয় রঙ্গালয়, জাতীয় সংবাদপত্র এমন-কি জাতীয় সার্কাস। নব-গোপাল একে একে সব কিছুই গড়ে তুলতে লাগলেন।

১৮৬৭। এপ্রিলের ১২ তারিখে বেলগাছিয়ায় ডনকিন্ সাহেবের বাগানবাড়িতে প্রথম শুরু হল হিন্দু মেলা। প্রথম বছরে তেমন জমলো না। দ্বিতীয় বছরের মেলা একদম সরগরম।

১৮৭২। তৈরি হল ন্যাশনাল থিয়েটার। তার পরেই সার্কাস। ঠাকুরবাড়ির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই নিয়ে মজা করে লিখেছেন—"কতক-

গুলো মড়াখেগো ঘোড়া লইয়া নবগোপালবাবুই সর্বপ্রথম বাঙালী সার্কাসের সূত্রপাত করেন। আজ যে বোসের সার্কাসের কৃতিত্ব এবং নানা প্রশংসাবাণী শুনা যায়, উহা তাহারই পরিণতি এবং নবগোপালবাবুর অনুষ্ঠিত সেই প্রথম বাঙালী সার্কাসেরই চরম ক্রমোন্নতি বলিতে হইবে।"

এরপর 'ন্যাশনাল পেপার'-এর কথা। সেটা অবশ্য আগেই বেরিয়ে গেছে। সেটা ১৮৬৫-তে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া'য় এই নবগোপাল মিত্রকে অমর করে রেখেছেন তাঁর অপরূপ বর্ণনার ভিতরে। খানিকটা না শুনিয়ে পারছি না।

"এইবারে হিন্দু মেলার গল্প বলি শোনো। একটা ন্যাশনাল স্পিরিট কী করে যেন তখন জেগেছিল জানিনে কিন্তু চারিদিকেই ন্যাশনাল ভাবের ঢেউ উঠেছিল। এটা হচ্ছে জ্যাঠামশায়ের আমলের, বাবামশায় তখন ছোটো। নবগোপাল মিত্তির আসতেন, সবাই বলতেন ন্যাশনাল নবগোপাল, তিনিই প্রথম ন্যাশনাল শব্দ শুরু করেন। তিনিই চাঁদা তুলে 'হিন্দু মেলা' শুরু করেন। তখনও ন্যাশনাল কথাটার চল হয়নি। হিন্দু মেলা হবে, জ্যাঠামশাই গান তৈরি করলেন

মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের জয় গান।

এই হলো তখনকার জাতীয় সংগীত। ফি বছর বসন্তকালে মেলা হয়। যাবতীয় দেশী জিনিস তাতে থাকত। শেষ যে-বার আমরা দেখতে গিয়েছিলুম এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে— বাগানময় মাটির মূর্তি সাজিয়ে রাখত, এক একটি ছোট্ট চাঁদোয়া টানিয়ে বড়ো বড়ো মাটির পুতুল তৈরি করে। কোনটাতে দশরথের মৃত্যু, কৌশল্যা বসে কাঁদছেন এই রকম পৌরাণিক নানা গল্প মাটির পুতুল দিয়ে গড়ে বাগানময় সাজানো হতো। কী সুন্দর তাদের সাজাত মনে হতো যেন জীবন্ত।"

নবগোপালের স্বদেশীয়তায় আর এক রকম দৃষ্টি আঁকা আছে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা' বইয়ে। তিনি চাকরী করতেন

বোম্বাইয়ে। মাঝে মাঝে কলকাতায় এলে বিভিন্ন সভাসমিতিতে বক্তৃতা করতেন। একবার বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি তুললেন বাঙালী আর অ-বাঙালীর খাবারের কথা। বাঙালীরা খায় ভাত। অবাঙালীরা রুটি। বাঙালীর স্বভাবের দুর্বলতা তার মূলে অনেকখানিই রয়েছে ভাতের হাত। "এই কথা শুনে নবগোপালবাবু মহা চটে উঠলেন। তিনি চীৎকার করে আপনার অমত প্রকাশ করে বললেন, 'তা কখনই হতে পারে না। তোমরা যাই বলো, আমরা একবার ভাত খাব, দুবার ভাত খাব, তিনবার ভাত খাব।' নবগোপালের এই গর্জনের পর সভার সব গুঞ্জন চুপ।"

এবার গণেন্দ্রনাথের কথা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভাইপো গিরীন্দ্র-নাথের বড় ছেলে। গান গাওয়া, ছবি আঁকা, নাটক করা, ছেলেবেলা থেকেই দারুণ ঝোঁক। সেটা ১৮৬৭ সাল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বড়রা মিলে অভিনয় করলে নাটুকে রামনারায়ণের 'নব নাটক'। তিনি তখন ঠাকুরবাড়ির গৃহশিক্ষক। নাটকের জন্যে তাঁকে তো পারিশ্রমিক দেওয়া হলোই। গণেন্দ্রনাথের তাতেও আশা মিটল না। তিনি বললেন, এই বই ছেপে বের করা হোক। এক হাজার কপি বই ছাপাতে যা খরচ, আমি দেবো। এবং সে বইয়ের মালিকানা থাকবে লেখকেরই।

কিন্তু এ সব ছাড়িয়ে, তাঁর হৃদয়ের সবচেয়ে বড় পরিচয়, স্বদেশ-প্রীতিতে। যে চৈত্রমেলার কথা আগে বলেছি, এবং যে চৈত্রমেলাকে ঐতিহাসিক 'কংগ্রেসের অগ্রদূত' বলে থাকেন, গণেন্দ্রনাথ ছিলেন তার প্রাণপুরুষ। নিজের জাতির সকল মানুষকে মেলাতে হবে এক ঠাঁইয়ে, মেলাতে হবে নিজের দেশের শক্তি, স্বাস্থ্য, শিল্প, সঙ্গীত সব কিছুকে একসূত্রে, এই ছিল তাঁর মনের সাধ, বুকের ব্যাকুলতা। ১৮৬৮-র ১১ই এপ্রিল। হিন্দুমেলার দ্বিতীয় বছর। মেলা বসেছে বেলগাছিয়ায় আশুতোষ দেবের বাগানে। এর আরও দুটো নাম ছিল। কেউ বলে ডানকান সাহেবের বাগান। কেউবা ডনকেষ্টরের বাগান। মেলার সভাপতি গণেন্দ্রনাথ নিজের ভাষণে বললেন—

'এই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা, এইরূপ একত্র হওয়ার ফল যদ্যপি আপাতত কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলন এবং একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও আগোচর নাই। এক দিন কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখা শুনা হওয়াতে অনেক মহৎ কর্ম সাধন, অনেক উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে, যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দুমেলা ও ইহা হিন্দুদিগেরই জনতা— এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্ধিত হইতে থাকে। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কোন বিষয় সুখের জন্য ইহা স্বদেশের জন্য, ইহা ভারতভুমির জন্য।'

দেশপ্রেমের গান লেখার চলন হিন্দুমেলা থেকেই। এবং গণেন্দ্রনাথ সেকালের জাতীয় সংগীত লেখকদের অন্যতম পুরোধা। তাঁর লেখা গান—

লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে।
লুঠিতেছে পরে এই রত্নের আকরে॥
সাধিলে রতন পাই
তাহাতে যতন নাই
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা করে॥

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই গণদাদা সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তাতে আরও গভীর পরিচয় মেলে তাঁর প্রতিভার।

"বেশে-ভূষায়, কাব্যে-গানে, চিত্রে-নাট্যে, ধর্মে-স্বাদেশিকতার সকল বিষয়েই তাঁহার মনে একটি সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল। পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাস চর্চায় গণদাদার অনুরাগ ছিল। অনেক ইতিহাস তিনি বাংলায় লিখিতে আরম্ভ করিয়া অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত বিক্রমোর্বশী নাটকের একটি অনুবাদ অনেক দিন হইল ছাপা হইয়াছিল। তাঁহার রচিত ব্রহ্ম

সঙ্গীতগুলি এখনো ধর্মসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে।” সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ছেলেবেলার কাহিনী বলতে গিয়ে তাঁর প্রিয় মেজদা গণেন্দ্রনাথের যে ছবি এঁকে গেছেন, সেটাও ভারী অন্তরঙ্গ, “মেজদাদা আমাকে বড় ভালবাসতেন। আমিও তাঁর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলুম। আমরা ছুটিতে তেতালার ছাতে বসে গান করতুম, গল্প করতুম। কোজাগর পূর্ণিমায় হেসে খেলে বাগানে বেড়িয়ে রাত কাটাতুম। মেজদা গান বাজনা বড় ভাল বাসতেন। তিনি নিজেও অনেক সঙ্গীত রচনা করেছেন।···এদিকে অসঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় যেমন তাঁর পারদর্শিতা ছিল, সে সময়কার সাহিত্যিকদের মধ্যেও তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের একটি সুন্দর অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাঁর ভ্রাতাপুত্র গগনেন্দ্রনাথ এইটি উদ্ধার করে সাহিত্য সমাজে প্রচার করেছেন দেখে আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হয়েছে। তাঁর লিখিত কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছিল— আমি এক সময়ে তাঁর হাতের লেখা পুথি দেখেছি, আর তিনি আমাকে এক পত্রেও লিখেছিলেন যে ভারত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা লিখতে আরম্ভ করেছেন— মোগল সাম্রাজ্য মনে হচ্ছে। আক্ষেপের বিষয় যে সে সব লেখা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো, কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না···।”

গুণের মানুষ গণেন্দ্রনাথ জনগণের মানুষ হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে দিয়েছিলেন মাত্র ২৮ বছরের পরমায়ু।

বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র

বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র যে কোন্‌টা তা নিয়ে দু-রকমের মতামত। এক পক্ষের ধারণা সমাচার দর্পণ। আরেক পক্ষের সিদ্ধান্ত বাঙ্গাল গেজেটি। বাঙ্গাল গেজেটির আগে সমাচার দর্পণ যদি বেরিয়েও থাকে, তাহলেও বাঙালী-প্রবর্তিত পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র হিসেবেও বাঙ্গাল গেজেটি-র সম্মান কেড়ে নিতে পারবে না কেউ। সমাচার দর্পণ ছিল মিশনারীদের পরিচালিত পত্রিকা। বাঙ্গাল গেজেটি বেরোত প্রত্যেক সপ্তাহের শুক্রবারে। প্রথম সংখ্যা বেরোয় ১৮১৮-র ১৫ মে। এতে থাকতো সরকারী বিজ্ঞাপন, আইন আর কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত নানান রকমের সংবাদ, সরল বাংলায় নানাবিধ রচনা। মাসিক মূল্য দু টাকা।

বাঙ্গাল গেজেটির কর্ণধার গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য আমাদের কাছে অন্য কারণে আরো অনেক বেশি পরিচিত। এ বইয়ের গোড়ার দিকে 'প্রথম সচিত্র বাংলা বই' নামে যে অধ্যায়, সেখানে ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলের প্রকাশক হিসেবে অনেকখানি পরিচয় দেওয়া আছে তাঁর। ছাপাখানার সঙ্গে গঙ্গাকিশোরের আবাল্য পরিচয়। বাড়ি শ্রীরামপুরের বহরা নামের গ্রামে। মিশনারীরা নিজেদের ধর্মপ্রচারের সুবিধের জন্যে শ্রীরামপুরে প্রথম ছাপাখানা গড়ল যেদিন, গঙ্গাকিশোর চাকরী নিয়েছিলেন সেখানে কম্পোজিটর হিসাবে, ছাপাখানার যাবতীয় ব্যাপারে

এইখানেই তাঁর হাতে-খড়ি। পরে স্বাধীন জীবিকার খোঁজে চলে আসেন কলকাতায়। তারপরেই প্রথম উদ্যোগ, অন্যের ছাপাখানা থেকে ছাপিয়ে বাংলা বইয়ের প্রকাশনা। পরের ধাপে, নিজস্ব ছাপাখানা। সেটাও ঐ ১৮১৮ সালে। ছাপাখানার নাম, বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস বা আপিস। বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগবদ্‌গীতার পদে অনুবাদ করা যে বই তাতে ছাপা ছিল— 'বাঙ্গাল গেজেটি আফিসে ছাপা'। এর পরের ধাপেই তাঁর মনে হল, বাঙালী পাঠকের হাতে তুলে দেবার মতো একটা সংবাদ-পত্র ছেপে বের করবার সময় এসে গেছে। কলকাতা থেকে এখনো পর্যন্ত ছেপে বেরোয় না কোনো সংবাদপত্র। সুতরাং আমাকেই নামতে হবে এ কাজে। সঙ্গী অথবা সহকর্মী বা অংশীদার হিসেবে কাছে টেনে নিলেন আরেকজনকে। নাম, হরচন্দ্র রায়। তাঁর বাড়িও শ্রীরামপুরে। রামমোহন রায়-এর 'আত্মীয় সভা'য় যাতায়াত ছিল তাঁর। রামমোহনের লেখা 'কবিতাকারের প্রতি প্রত্যুত্তর' বইয়ের পাতায় নাম পাওয়া যায় তাঁর। পরে কোনো এক সময় হরচন্দ্রের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটে গঙ্গা-কিশোরের। আলাদা হয়ে যান দুজন। গঙ্গাকিশোর তাঁর ছাপাখানাকে কলকাতা থেকে তুলে নিয়ে যান নিজের গ্রামেই।

বাঙ্গলা গেজেটি-র কোনো সংখ্যাই চোখে দেখার উপায় নেই এখন। বাংলা সংবাদপত্র নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁরাও সুযোগ পাননি দেখার। প্রথম কারণ, কাগজটা চলেনি বেশি দিন। দ্বিতীয় কারণ কোনো সংগ্রহশালাতেই নেই তার কোনো কপি। তবে একজন দেখে-ছিলেন, সন্দেহ নেই তাতে। তিনি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ঈশ্বর গুপ্ত কবি হলেও আমাদের দেশে প্রথম দৈনিক পত্রের সম্পাদক। নাম, 'সংবাদ প্রভাকর'। জন্ম ১৮৩১-এর ২৮ জানুয়ারি। প্রথমে ছিল সাপ্তাহিক। দৈনিক হয়েছিল পরে। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর প্রভাকরে এক সময় সংবাদপত্রের ইতিহাস লিখতে থাকেন। সেখানে প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের সম্মানের তিলক পরিয়ে দেন 'সমাচার দর্পণ'-এর কপালে নয়, 'বাঙ্গাল গেজেটি'-র ললাটেই। আবার ঐ ঈশ্বর গুপ্তের প্রথম হয়তো

একমাত্র জীবনী লেখক বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর 'ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' নামের রচনায় এক জায়গায় লিখেছেন—

"যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বশক্তি এবং রচনাশক্তি দর্শনে এই সময়ে অর্থাৎ ১২৩৭ সালে বাঙ্গলা ভাষায় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিতে অভিলাষী করেন। ইহার পূর্বে ৬ খানি মাত্র বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়াছিল। (১) 'বাঙ্গালা গেজেট'— ১২২২ সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশ হয়। ইহাই প্রথম বাঙ্গলা সংবাদপত্র। (২) 'সমাচার দর্পণ'— ১২২৪ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারীদিগের দ্বারা প্রকাশ হয়। (৩) ১২২৭ সালে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে 'সংবাদ কৌমুদী' প্রকাশ হয়। (৪) ১২২৮ সালে 'সমাচার পত্রিকা', (৫) 'সংবাদ তিমির নাশক' এবং (৬) বাবু নীলরত্ন হালদার কর্তৃক 'বঙ্গদূত' প্রকাশ হয়।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিবরণে 'বাঙ্গালা গেজেট'-র প্রসঙ্গে গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের নাম শুনে অবাক হতে পারে কেউ কেউ। এই তো শুনে এলাম এতক্ষণ গঙ্গাকিশোর। হঠাৎ গঙ্গাধর হয়ে গেল কি করে। এ ভুল শুধু বঙ্কিমচন্দ্রেরই ঘটেনি। আরো অনেক রচনাতেই গঙ্গাকিশোরের জায়গায় গঙ্গাধর। 'বাঙ্গালা গেজেট' সম্ভবত মাঝে মাঝেই পুনর্মুদ্রণ করতো কোনো কোনো রচনার। অন্তত একবার তো করেই ছিল। সেটা রামমোহন রায়ের সতীদাহ বিষয়ের প্রবন্ধ। এতবড় একজন উদ্যোগী পুরুষের কোনো জীবনী নেই। অথচ তিনি এমন একজন মানুষ যাঁকে বাদ দিয়ে বাংলা বই আর বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস লেখা যাবে না কোনোদিন।

প্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার কদিন পরেই আবার জেল। আবার অ্যাটর্নি উইলিয়ম হিকির কাছে কাতর নিবেদন, চিঠির মারফৎ। আপনি আমাকে বাঁচালেন। সৌভাগ্যক্রমে সেবারেও বিশ হাজার টাকার মিথ্যে মামলার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেলেন তিনি। আর জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলেন অন্য মানুষ হয়ে। না, অন্য মানুষ হয়ে নয়। কারণ, বদমেজাজী স্বভাবটা মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্তও ছায়ার মতো লেগে ছিল তাঁর সঙ্গে। জেলখানা থেকে বেরোলেন অন্য এক সংকল্পের মানুষ হয়ে। দ্বিতীয়বার জেলখানায় থাকার সময়ে হঠাৎ হাতে এসে যায় ছাপাখানা সংক্রান্ত একটা বই। বইটা শেষ করেই মনে মনে সংকল্প, এবার জেল থেকে ছাড়া পেলেই হয়ে যাবেন প্রিন্টার। হলেনও তাই। প্রথম প্রথম ছাপতেন হ্যাণ্ডবিল আর বিজ্ঞাপন। লোকের কাছে সেগুলো কদর পাচ্ছে দেখে লাভের টাকা পাঠিয়ে দিলেন ইংলণ্ডে, ছাপাখানার যন্ত্রপাতির অর্ডার দিয়ে। মজার ব্যাপার হল, প্রিন্টিং মেশিনের সঙ্গেই ছিল আরও একটা জিনিসের অর্ডার। সেটা ওষুধ। হিসেবটা কষা ছিল এইভাবে যে, যদি ছাপাখানাটা না জমাতে পারেন, তাহলে ব্যবসা করবেন ওষুধের। তবে বন্ধু-বান্ধবের কাছে প্রিন্টার হওয়া নিয়ে বেশি আলোচনা। আচ্ছা, আমি যদি একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করি, কেমন হয়? সকলেই সমর্থন জানাল এই শুভ

উদ্দেশ্যকে। কারণ কলকাতায় এত ইংরেজ, অথচ সংবাদপত্র নেই একখানাও। যথাসময়ে ইংলণ্ড থেকে এসে গেল ছাপাখানার যন্ত্রপাতি। জেলখানার জেমস হিকি হয়ে উঠলেন ছাপাখানার হিকি। আর তাঁর কপালেই জুটে গেল 'কলকাতার প্রথম সংবাদপত্রের জনক' হওয়ার বিরাট সম্মান। তখনও বিলেতে বিখ্যাত টাইমস পত্রিকা বেরোতে শুরু করে নি। তার আট বছর আগেই ১৭৮০-র ২০ জানুয়ারী শনিবার কলকাতা থেকে ছেপে বেরোল জেমস হিকির সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, বেঙ্গল গেজেট।

দৈর্ঘ্যে বারো ইঞ্চি। প্রস্থে আট। এই রকম দুখণ্ড কাগজ। প্রত্যেক পাতায় তিনটে করে কলম। বেশির ভাগটাই বিজ্ঞাপন। তার পরই ফাঁক ফোকরে কলকাতা আর মফস্বলের চিঠিপত্র। আর য়ুরোপ থেকে যে-সব নতুন খবর আসতো, তার কিছু কিছু। হিকি তার সম্পাদকীয় মারফৎ জানিয়ে দিয়েছিল। কাগজটা রাজনীতি আর বাণিজ্য বিষয়ক। 'সকলের কাছেই উন্মুক্ত, কিন্তু কাহারও প্রভাব দ্বারা পরিচালিত নয়।' হিকিই তাঁর পত্রিকার সর্বেসর্বা। তিনিই প্রকাশক, মুদ্রাকর আর স্বত্বাধিকারী।

হিকির কাগজের গ্রাহক ছিল প্রধানত বেসরকারী য়ুরোপীয় সমাজের মানুষজন আর যাদের পেশা স্বাধীন বাণিজ্য। সরকারী লোকজন দুচক্ষে দেখতে পারতো না কাগজটাকে। কারণ সমাজের শিরোমণি জাতীয় লোকজনের বিরুদ্ধে হিকির কাগজে নিয়মিত বিষোদ্গার। আর বিশেষ করে হিকির আক্রমণ তখন যে দু'জনকে, তার একজন হলেন সস্ত্রীক হেস্টিংস সাহেব, আর দ্বিতীয়জন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পে। হিকি অবশ্য কারো নাম করে কিছু লিখতেন না। যাঁকে আক্রমণ করতেন, তার একটা নতুন নাম দিতেন মজা করে। আক্রমণটা করতেন একটা বিশেষ পদ্ধতিতে। নাটক প্রহসন বা কনসার্টের বিজ্ঞাপনের আদলে লিখতেন সেগুলোকে। যেমন একটা প্রহসনের নাম 'এ ট্রাজেডী কল্ড টির‍্যানি ইন ফুল ব্লু অর দা ডেভিল টু পে।' ঐ প্রহসনে

হেস্টিংসের নাম, 'রং-হেড গ্রাণ্ড তুর্ক'। ইম্পের নাম 'জাজ জেফরেজ'। আবার ইম্পে বেনামীতে ঠিকেদারী করতেন বলে তাঁর দ্বিতীয় নামও ছিল আরেকটা, 'পুলবুডি'। আর পাদরী কিয়েরন্যাণ্ডারের নাম, 'মামুন'। আর হিকির নিজের নাম 'দি ট্রু বর্ন ইংলিশম্যান'। সমাজের উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ বা রাজকর্মচারী ছাড়াও, কলকাতার সাধারণ অধিবাসী আর বিশেষ করে অভিজাত সমাজের মহিলা এদের কারুরই নিস্তার নেই তাঁর ঠাট্টা-বিদ্রূপ থেকে। এক ভদ্রমহিলার নাম 'মিস র‍্যাংহাম'। হিকির কাগজে তাঁর নতুন নামকরণ হয়ে গেল 'হুঁকা টারবান'। এক ভদ্রলোকের নাম, মিঃ টেলর। হিকির কাগজে তাঁর নতুন নামকরণ হয়ে গেল 'মিঃ দর্জি'।

নিজের মক্কেল সম্বন্ধে উইলিয়ম হিকি তাঁর বিখ্যাত মেমোয়ার্সে এক জায়গায় লিখছেন একটা মজার কাহিনী। কলকাতা শহরে তখন টিরেটা নামে একজন ভদ্রলোক ছিলেন, যাঁর পেশা ছিল স্থাপত্য। তিনি ইটালীয়ান হলেও জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন ফ্রান্স আর জার্মানীতে। এই ব্রিটিশ উপনিবেশে প্রায় কুড়ি বছর কাটিয়েও তিনি রপ্ত করতে পারেননি ইংরেজি ভাষাটা। কথা বলার সময় ব্যবহার করতেন এমন একটা জগাখিঁচুড়ী, যা ইংরেজি, ফরাসী, পর্তুগীজ আর হিন্দুস্থানী জানা না থাকলে কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। দেখতে শুনতে সুপুরুষ। তবে সকলের আগে চোখে পড়তো তাঁর দীর্ঘ, তীক্ষ্ণ উন্নত নাসিকাটি। গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি উত্তাপ বাড়ে জুন মাসে; তা সত্ত্বেও জুন মাসের বার তারিখে রাজার জন্মদিন উপলক্ষে গভর্নরের নাচসভায় দামী ভেলভেটের স্যুট পরে সেজেগুজে যোগ দিতেন তিনি প্রত্যেক বছরই। একবার এই নাচসভার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি ঐ টিরেটা সম্বন্ধে লিখলেন: 'নোজী জারগণ ড্যান্সড হিজ অ্যানুয়াল মিনুয়েটস, সিজন্যালি ড্রেসড ইন এ ফুট স্যুট অফ ক্রিমসন ভেলভেট।' টিরেটা সম্বন্ধে এমন চমৎকার নামকরণ আগে কেউ করতে পারেনি। তারপর থেকেই গোটা কলকাতায় টিরেটার নাম হয়ে গেল 'নোজী জারগণ'। লম্বা নাকের জন্যে 'নোজী'। আর পাঁচমিশেলী ভাষার জন্যে 'জারগণ'।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেশি বাড়াবাড়ি করতে গিয়েই হিকি সাহেবকে পড়তে হল বিপাকে। কাউকে সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি ব্যবহার করতে লাগলেন কুৎসিত গালাগালির ভাষা। হিকির যেমন যত আক্রমণ সব হেস্টিংসকে লক্ষ্য করে, হেস্টিংসও তেমনি খুঁজছিলেন হিকিকে শায়েস্তা করার রাস্তা। ১৭৮০ নভেম্বরের ১৪ তারিখে গভর্নমেণ্ট নির্দেশ পাঠালেন জেনারেল পোস্ট আপিসে, যাতে বন্ধ করে দেওয়া হয় ঐ কাগজ। হিকি তখন ২০ জন হকার রেখেছিলেন কাগজ বিলি করার জন্যে। তাদের ডেকে বললেন, আমাকে যদি কাগজ বন্ধ রেখে হোমারের মত ছোট ছোট গাথা রচনা করে কলকাতার রাস্তায় ফেরি করে বেড়াতে হয়, তাও করে যাবো, কিন্তু গভর্নমেণ্টের বিরোধিতা করতে ছাড়বো না। এই গোঁয়াতুর্মির পরিণামে ঘটল হাজতবাস।

১৮৭১। হেস্টিংস তাঁর নামে মামলা রুজু করে দিলেন দু-দফা। এতেও যদি কোনমতে বাঁচলেন, পরের বছরই, মার্চ মাসে, আদালতের হুকুমে বাজেয়াপ্ত করা হল তাঁর ছাপাখানা।

ব্যারিস্টার উইলিয়ম হিকি চার বছরের জন্যে চলে গিয়েছিলেন কলকাতা ছেড়ে নিজের দেশে। ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই জেলখানা থেকে জেমস হিকির চিঠি। আমি জেলখানায় পচছি। দয়া করে একবার দেখা করুন আমার সঙ্গে।

দেখা করার সঙ্গে সঙ্গে হিকির একলক্ষ অভিযোগ হেস্টিংস আর ইম্পের উপর। তারাই ওকে চক্রান্ত করে জেলখানায় পচাচ্ছে। জুরীরা বারবার রায় দিয়েছে, আমি নিরপরাধ। তবুও আমার এই শাস্তি। আমার কারাবাসের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে কবে, তবুও ছাড়ছে না। ব্যারিস্টার হিকি অনেকবারই বাঁচিয়ে দিয়েছেন সাংবাদিক হিকিকে। কিন্তু তাঁকে বাঁচানো বড় কঠিন। বিচারের সময় জুরীদের মধ্যে জন রাইডার নামে একজনকে দেখতে পেয়েই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েই হিকির তাণ্ডব নাচ। ও লোকটা জুরী হয় কি করে? ও তো ইম্পের মোসাহেব। লোভী ইম্পের জামা-কাপড় কিনে বেড়ায় দোকানে

ঘুরে ঘুরে, বিচারকের আসনে বসে ইম্পের তখন লজ্জায় মরো মরো অবস্থা।

কলকাতার প্রথম সংবাদপত্রের জনক এই হিকি সম্বন্ধে উইলিয়ম শেষ মন্তব্য লিখেছিলেন নিজের মেমোয়ার্সে, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে :

"আমি একজন খেয়ালী আর পাগলাটে ধরনের মানুষকে দেখলাম, যার প্রতিভা আছে কিন্তু তা অনুশীলন বা চর্চার দ্বারা মার্জিত নয়। তার পাগলামির জন্যে আমি তাঁকে ডাকতাম 'ক্ষ্যাপা আইরিশম্যান' বলে।"

প্রথম বাগান

আহা! কী দেখছি। এ যেন মহাকবি মিলটনের ইডেন উদ্যান! বোটানিক গার্ডেন দেখে সেকালের অনেক বিখ্যাত ইংরেজদের মনের খুশী এইভাবে ফেটে পড়েছে। কিন্তু আরেকদল ইংরেজের মনে খেদ ছিল – বোটানিক গার্ডেন যত ভালই হোক, ওটা তো ঠিক বেড়াবার, বিশ্রাম নেবার, বাতাস খাওয়ার বাগান নয়। তাছাড়া জায়গাটা নদীর ওপারে। এপারের মানুষদের জন্যে সত্যিকারের প্রমোদ-কানন একটা না-হলে শহরের না বাড়ে মানইজ্জৎ, না কমে মনের সুখে সন্ধ্যে কাটাবার আফশোস।

১৮৩৬। চার্লস মেটকাফের পর নতুন গভর্নর জেনারেল হয়ে কলকাতায় এলেন লর্ড অকল্যাণ্ড। বিয়ে করেননি। সঙ্গে এলো কিন্তু দুই বোন। এমিলি ইডেন আর তাঁর ছোট বোন ফ্যানী। অকল্যাণ্ডরা পাঁচ ভাই আট বোন। ছ'বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাকী এঁরা দু'জন। দাদার সঙ্গে ভারী দোস্তী। তাই যখন শুনলে দাদা যাচ্ছে ভারতবর্ষে, বোনেরাও ধরে বসল সঙ্গী হবার বাসনায়। এমিলির স্বাস্থ্য ছেলেবেলা থেকেই তেমন শক্ত নয়। অনেক ভয়ে দেখালো, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জল হাওয়ায় তার রোগা শরীর আরো ভাঙতে পারে। যা হবার, হবে, এমিলির বায়না, আমি যাবোই। দুই বোন সত্যিই চলে এল কলকাতায়। এমিলির অনেক গুণ। লিখতে পারেন। আঁকতেও। পরে নিজের আঁকা ছবির বইও বেরিয়েছে তাঁর। কবি-কবি মন। তাই যে শহরে

বাস, সেটাকে ছবি-ছবি দেখতে তাঁর ভারী সাধ। বাগান নেই কলকাতায় এটা তাঁর চোখে পড়েছিল। নিজের চেষ্টায় তিনি উঠে পড়ে লাগলেন বাগান বানাতে। তার ফলেই ইডেন গার্ডেন। কলকাতার নন্দন কানন। কেউ মনে করেন জমিটা রানী রাসমণির উপহার দেওয়া মিস ইডেনকে। কেউ মনে করেন জায়গাটা মীরজাফরের কাছ থেকে সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায় করা।

মাটিতে সবুজ ঘাস। রঙীন ফুল গাছে গাছে। পশ্চিম দিকে ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ড। প্রত্যেকদিন বিকেলে ফোর্ট উইলিয়মের বাজনাদার এসে বাজনা বাজাতো সেখানে। রাত্রিতে যেন জ্যোৎস্না ফুটতো, এমন আলোকসজ্জা চারপাশে। রেঙ্গুন থেকে বর্মী প্যাগোডা এনে বসানো হয়েছিল এর ভিতরে, মাঝে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন হল মেরামত হয়েছে। গোড়ার যুগে লর্ড অকল্যাণ্ডের প্রতিমূর্তি ছিল এই বাগানের মধ্যে। এখন নেই। ক্যাপটেন ফিটজেরল্যাণ্ডের উপর ভার ছিল বাগান তদারকির। এখন এই বাগানের গায়েই ক্রিকেটের মাঠ। রণজি স্টেডিয়াম।

নিজের গুণপনায় এমিলি শুধু ইংরেজ মহলেই নন, সম্ভ্রান্ত বাঙালী পরিবারের কাছেও প্রিয়। প্রিন্স দ্বারকানাথ তখন খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে মাঝ আকাশের সূর্যের মত। তাঁর বেলগাছিয়া ভিলা নামের বাগান-বাড়ি ছিল সেকালের দেশী-বিদেশী গণ্যমান্যদের মেলামেশার জায়গা। এখানে একটা নিমন্ত্রণ পাওয়া সাহেব বাঙালী সকলের কাছেই একটা সৌভাগ্য।

এমিলিকে সম্বর্ধনা জানাতে দ্বারকানাথ এক ভোজসভা ডাকলেন নিজের বাগানবাড়িতে। ঘরে ঘরে আয়না। ঠিকরে পড়ছে আলো। মেঝেয় পাতা মীর্জাপুরী কার্পেট। বুটিদার লাল কাপড়, সবুজ সিল্কের পর্দা উড়ছে বাতাসে। শ্বেতপাথরের টেবিলে ফুলের তোড়া। সিঁড়ি, বারান্দা, বৈঠকখানা, হলঘর দামী দুষ্প্রাপ্য অর্কিড আর লতাপাতার গাছ দিয়ে সাজানো। বাগানের মধ্যে ঝুলন্ত সেতু। লতাপাতা, ফুল,

দেবদারু পাতা আর পতাকা দিয়ে মোড়া। উঠোন জুড়ে হাজার হাজার বাতি। ভোজসভার সঙ্গে নাচের আসর। নাচের সঙ্গে গান। বাইরে তখন আকাশ জুড়ে আর এক চন্দ্র সূর্যের আকাশ। লাখ লাখ নক্ষত্র ফাটছে, ফুটছে, আলোর ফুল হয়ে। সেদিনের মত বাজী পোড়ানো কলকাতার কেউ নাকি দেখেনি কখনো। তবে আসল বাগানের কথা শুনতে হলে ফিরে যেতে হবে আগের শতাব্দীতে।

শীতটা এখন মিঠেকড়া। এখন রোদে ঘুরতে ভারী মজা। আর মজা পিকনিক। পিকনিক বললেই আমাদের সকলের মনে পড়ে একটা বাগানের নাম। কিংবা ছবি। ঠিক বলেছো, বোটানিক্যাল গার্ডেন। তবে ওটা কিন্তু ওর ডাক নাম। আসল নাম ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন। ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারির প্রজাতন্ত্র দিবসে ঐ নাম দেওয়া হয়েছে ওকে। তার আগে ছিল রয়্যাল বোটানিক গার্ডেন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে ঐ নাম। তারও আগে আরও একটা নাম চলে ফিরে বেড়াত লোকের মুখে মুখে। 'কোম্পানীর বাগান।' তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই এদেশে সর্বেসর্বা।

প্রথম যাঁর মাথায় ঐ বাগানটা গড়ার ইচ্ছে জেগেছিল তিনি কিন্তু খুব একটা কেউ-কেটা গোছের মানুষ ছিলেন না। সাধারণ সৈনিক। নাম রবার্ট কীড। যে সময়ের কথা, তখন হেস্টিংস সাহেব চলে গেছেন বিলেতে। লর্ড কর্নওয়ালিস আসবেন আসবেন করছেন নতুন গভর্নর জেনারেল হয়ে। মাঝখানে কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে বড়লাট সাজিয়ে রাখা হয়েছে জন ম্যাকফারসনকে। সেই সময়ে কীড সাহেব প্রস্তাবটা নিয়ে হাজির।

স্যার, একটা পরীক্ষামূলক বাগান তৈরির খুব দরকার আমাদের। বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের অভাব-অনটন তো লেগেই আছে। মালয় থেকে সাগুর গাছ এনে আমরা চাষ করতে পারি অনায়াসে। দারুচিনির গাছ কেবল সিংহলেই। অথচ আসামের জঙ্গলে আমি এমন গাছ দেখেছি, যা অবিকল দারুচিনির মত। একটু খাটাখাটুনি করলে ঐ বাগানে

আমরা ঢাকাই তুলো, নীল, চেরা, চন্দন, লাক্ষা, সেগুন, লংকা, তামাক দারুচিনি, সাগু, এলাচ, পেঁপে, চা এইরকম হরেক গাছের ফসল ফলাতে পারি। আমাদের ইংলণ্ডকেও এই জিনিসের জন্যে ভিখ মাগতে হয় পরের দেশের দরজায়। বাগানটা হলে দু'দেশেরই লাভ। ফলভোগ করবো সকলেই।

বড়লাট খুব খুশী। প্রস্তাব পাঠিয়ে দিলেন বিলেতে খোদ মালিক-দের হেফাজতে। বিলেত জানালে—ভালোই তো। কাজ শুরু করে দাও। শুরু অবশ্য তার আগেই হয়ে গেছে, গঙ্গার ওপরে তিনশো একর জমি দখল করে। এখন অবশ্য জমির এলাকা ছশো তিয়াত্তর একরকে ছাড়িয়ে গেছে। সেদিনটা ছিল ১৭৮৭-র ১৮ মে। কীড সাহেবকে দেওয়া হল সরকারী বাগানের অধ্যক্ষের সম্মান।

তারপর কীড মারা গেলেন। তাঁর জায়গায় এলেন রক্‌স্‌বার্গ। রক্‌স্‌বার্গের সঙ্গে যোগ দিলেন কেরী। কেরী তখন থাকেন শ্রীরামপুরে। লেখাপড়াই তাঁর আসল কাজ। কিন্তু বাগানের নেশাটাও কম নয়। ঘরের সামনেই ছোট্ট বাগান। নিজের হাতে সাজানো গুছোনো। গাছপালা আনান দেশবিদেশ থেকে। তাদের ফুলন্ত করে তোলেন দিনরাত্তিরের যত্ন-আত্তি দিয়ে। নিজের এক ছেলে থাকতো তখন যবদ্বীপে। তার মারফতও প্রচুর গাছ-গাছড়া আনিয়েছিলেন।

রক্‌স্‌বার্গের সঙ্গে ভাব জমার পর নিজের বাগানের প্রচুর গাছ উপহার দিলেন বোটানিক গার্ডেনকে। রক্‌স্‌বার্গ কেরীকে ভালবেসে তাঁর নামে নামকরণ করে দিলেন একটা গাছের। বিশেষ ধরনের একটা শাল গাছের চারা এসেছিল হাতে। নাম হয়ে গেল 'কেরিয়া শালিয়া।'

রক্‌স্‌বার্গকে বলা হয় 'ফাদার অব ইণ্ডিয়ান বোটানী'। কীড সাহেবের কল্পনার বাগান তাঁর উদ্যমেই হয়ে উঠল পৃথিবীর এক সেরা উদ্যান। বোটানিক গার্ডেনে ঢুকলেই দেখতে পাবে বিপুল এক বটগাছ। দেড়শো বছরেরও বেশী বয়স তার। একাই একটা অরণ্য যেন। সেই গাছও ঐ রক্‌স্‌বার্গের নিজের হাতে রোয়া।

প্রথম কংগ্রেস সভাপতি

এ বছর বোম্বায়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একশ বছর পূর্তির উৎসব হয়ে গেল। ঠিক একশ বছর আগে এই বোম্বায়েই প্রথম অধিবেশন হয়েছিল সবে তৈরি-হওয়া কংগ্রেস দলের। আর সে অধিবেশনের সভাপতি হয়েছিলেন একজন বাঙালী। নাম উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেকে উমেশচন্দ্রকে জানে না। জানে ডবলিউ সি ব্যানার্জীকে। ঐ নামেই তিনি ভারতবিখ্যাত।

গোঁড়া কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে। ঠাকুর্দা পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী জেলার পৈত্রিক ভিটে ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন ভাগ্য ফেরাতে। সেটা ১৮০০ সাল। ইংরেজ অ্যাটর্নীদের ব্যবসায়ে চাকরী। কোম্পানীর নাম কোলিয়ার অ্যাণ্ড বার্ড। এরা সরকারী সলিসিটার সেই সময়ে। ভাগ্য তাঁর হাতে তুলে দিল প্রচুর অর্থ। জমি কিনে বিশাল বাড়ি বানালেন খিদিরপুরে। ছেলে গিরীশচন্দ্রও হলেন অ্যাটর্নী, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সুপ্রীম কোর্টে। তাঁরও রোজগারপাতি অগাধ। অ্যাটর্নী মহলে তাঁর ডাক নাম 'প্রিন্স', দুই বিয়ে। বাড়িতে প্রথম সন্তান হয়ে জন্মালেন উমেশচন্দ্র। পরে গিরীশচন্দ্র খিদিরপুর ছেড়ে চলে এলেন সিমলায়, নতুন বাড়ি বানিয়ে। পরিবর্তন ঘটালেন আরো একটা। পদবী বন্দ্যোপাধ্যায়কে বদলে করলেন ব্যানার্জী। উমেশচন্দ্র ছেলেবেলা থেকেই পড়াশোনায় ভাল। হিন্দু স্কুলের ছাত্র। পড়তে

পড়তেই পেয়ে গেলেন তখনকার বিখ্যাত পার্শী ব্যবসায়ী জামসেদজী জিজিবয়ের দেওয়া স্কলারশিপ, যার ফলে ইংলণ্ডে গিয়ে পড়াশোনা করতে পারবেন তিনি। উমেশচন্দ্র তখন মনে প্রাণে সাহেব। এমনকি নিজের নামের ইংরেজি বানানকে পালটে দিয়ে হয়েছেন Womesh। স্কলারশিপ পেয়েই বিলেত যাওয়ার ইচ্ছেটা কুঁড়ি থেকে ক্রমশ ফুল হয়ে ফুটতে লাগল তাঁর মনের ভিতরে। যদিও যাওয়াটা আদৌ সহজ নয় তাঁর কাছে। যেতে হলে ছিঁড়তে হয় অনেক বাঁধন। বিয়ে হয়েছে পনেরো বছর বয়সে। স্ত্রীর নাম হেমাঙ্গিনী। কলকাতার বিখ্যাত ধনী পরিবার বিশ্বনাথ মতিলালের পৌত্রী। ঐ হেমাঙ্গিনীর পিসতুতো ভায়ের সঙ্গে আবার বিয়ে হয়েছিল উমেশচন্দ্রের এক বোনের। হেমাঙ্গিনী কিন্তু খুব সাধারণ মেয়ে নন। তাঁর ছিল নিজস্ব ব্যক্তিত্ব। তাই ব্রাহ্মণ পরিবারের বৌ হয়েও নিজের ইচ্ছায় দীক্ষা নিয়েছিলেন খৃষ্টান ধর্মে। উমেশচন্দ্রের বাড়ির আবহাওয়ায় যতই সাহেবিআনার চাল থাকুক, ছেলে কালাপানি পেরিয়ে বিলেত যাবে, এতে সায় ছিল না কারোর। বিলেতে গেলেই জাত যেত তখন। একঘরে হতে হতো সমাজে। নিজের পরিবারেও জুটত না স্নেহ-সম্মান। শ্রীনাথ দাসের ছেলে দেবেন্দ্রনাথ দাস বিলেত গিয়েছিলেন বলে তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণভামিনী পর্যন্ত ছেড়ে গিয়েছিলেন স্বামীকে। এমনকি নিজের একমাত্র মেয়েকে এক পলক চোখে দেখারও অধিকার ছিল না তাঁর। উমেশচন্দ্র এসব জানতেন। জেনেও নিজের স্বপ্নে অনড়। আর প্রত্যেকটা দিন সুযোগ খোঁজেন কিভাবে পালাবেন বাড়ি ছেড়ে। দেখতে দেখতে সুযোগ এসে গেল একদিন। ১৮৬৪। কলকাতা তখন দুর্গাপুজোর উৎসবে মাতোয়ারা, পুজোর শেষ দিনে বিজয়া। সেদিন বাড়ির সবাই বিজয়া করতে বেরিয়ে গেছেন বাড়ির বাইরে। এই তো সুবর্ণ সুযোগ। সকলের চোখের আড়ালে উমেশচন্দ্র বাড়ি থেকে পালিয়ে সোজা গঙ্গার ধারে। সেখান থেকে জাহাজে। জাহাজ ভাসল সমুদ্রে। তারপর স্বপ্নের দেশ ইংলণ্ডে পৌঁছে গেলেন একদিন সত্যি সত্যিই। তাঁর এই পালানোর ব্যাপারে বিপদে-আপদে, সমস্যা-সঙ্কটে সাহায্য করেছিলেন

একজন সাহেব। নাম, ককরেল স্মিথ। বিলেতে গিয়ে পড়লেন টাকা-পয়সার টানাটানিতে। বাড়ি থেকে সাহায্য আসার সম্ভাবনা নেই সামান্যও। শেষ পর্যন্ত সাহায্য এত এল, যখন তিনি ক্ষমা চাইলেন এবং অনুতাপ জানালেন নিজের আচরণের জন্যে। এর মধ্যেই পাশ করেছেন ব্যারিস্টারী। ১৮৬৭-তে ফিরে এলেন নিজের জন্মভূমিতে, পুরোপুরি সাহেব হয়ে। মাত্র অল্প কদিন আগে মারা গেছেন গিরীশচন্দ্র। উমেশচন্দ্র পিতৃশ্রাদ্ধের অধিকারী নন আর। ছোটভাই সত্যধনকে সামনে রেখে নিজেই ব্যবস্থা করলেন শ্রাদ্ধের। নিমন্ত্রণ জানানো হল শহরের ব্রাহ্মণ কায়স্থদের। কিন্তু কেউই সাড়া দিলেন না সে আমন্ত্রণে। তার একটা কারণ হয়তো হল, সমাজের নিয়ম মেনে প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজী না-হওয়া।

বাবার মৃত্যুর পর সংসারে আর্থিক সঙ্কট। উমেশচন্দ্রই নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন সংসারের যাবতীয় দায়। কিন্তু থাকেন সংসারের বাইরে, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও মেলামেশা বন্ধ। হোটেল থেকে কোর্টে। কোর্ট থেকে সিমলায় মায়ের কাছে। যেহেতু ছেলে বিধর্মী, তাই তাঁর জন্যে আলাদা থালা-বাসনে আলাদা জায়গায় খেতে দেওয়া।

উমেশচন্দ্রের সময়ে কলকাতা শহরে ব্যারিস্টার অনেক। কিন্তু তারা ইংরেজ। বাঙালী ব্যারিস্টার কতজন তা গুণতে হাতের পাঁচটা আঙুলও লাগে না। ফলে হাইকোর্ট পাড়ায় উমেশচন্দ্রের খ্যাতিমান হয়ে উঠতে সময় লাগল না বেশি। বিলেতে থাকার সময় সেখানকার আদব-কায়দা তাঁর মুখস্থ। বাঙালী ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র অনায়াসে টেক্কা দিতে পারেন সাহেবদের। বিলেত-বাসের দিনগুলো আরো একটা জিনিস শিখিয়েছিল তাঁকে, সেটা হল মনের সংস্কারমুক্তি। তিনি বুঝেছিলেন জাতিভেদ, ধর্মের গোঁড়ামী এসব ব্যাপারগুলো যে সমাজের এগিয়ে চলার পথের শক্ত কাঁটা। তাঁর মনে তখন দুটো স্বপ্ন, এক, নিজে হবেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সভ্য, যা হতে পারেনি কেউ তখনো, দুই, ভারতবর্ষের ঐক্য।

তখনো অবশ্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রচেষ্টার সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক তৈরি হয়নি তাঁর। হঠাৎ কলকাতা শহরের একটা বড় ঘটনা, বদলে দিল তাঁর জীবনের ধারা।

আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে অথবা স্বাধীনতার পক্ষে যাঁরা যোদ্ধা তাঁদের জীবনের সঙ্গে উমেশচন্দ্রের প্রথম যোগাযোগের সূত্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলায়। সেটা ১৮৮৩ সাল। সুরেন্দ্রনাথ তখনো বাংলার মুকুটহীন রাজা হননি। 'বেঙ্গলী' নামে একটা কাগজের সম্পাদক। আর সে কাগজে সুরেন্দ্রনাথ যখন যা লেখেন, তাতেই যেন ফুটে বেরোয় আগুনের ফুলকি। তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করার কারণটা ছিল এই রকম। বড়বাজারের বটুকনাথ পণ্ডিতের বাড়ির শালগ্রাম শিলাকে দিয়ে কলকাতার হাইকোর্টে বিচারপতি নরিস সাহেবের এজলাসে একটা মামলা চলছিল। মামলার নিষ্পত্তির প্রয়োজনে নরিস সাহেব বাদী প্রতিবাদী দু'পক্ষের পরামর্শ নিয়েই শালগ্রাম শিলাটিকে হাজির করতে বলেন হাইকোর্ট চত্বরে। হিন্দু সমাজের আঁতে ঘা লাগে তাতে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাবা ভুবনমোহন দাস তাঁর নিজের সাপ্তাহিক কাগজে প্রতিবাদ জানান। সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে হিঁদুয়ানী-সুলভ সংস্কারের বালাই ছিল না কোনোরকম। উমেশচন্দ্রের মতো তিনিও স্বভাবে সাহেবি। তবুও দেশের মানুষের মর্মবেদনায় সাড়া দিয়ে নিজের কাগজে লিখে বসলেন কড়া এক সম্পাদকীয়, নরিস সাহেবকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে। আদালত অবমাননার অপরাধে রুল জারি করা হল তাঁর উপর। মামলার শুনানীর তারিখে ৪ মে ইংরেজ ব্যারিস্টারদের কেউই রাজী হলেন না সমর্থন করতে। রাজী হলেন উমেশচন্দ্র। উমেশচন্দ্রই পরামর্শ দিলেন দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নিতে। কারণ, নরিস যে বাদী এবং প্রতিবাদী দু'পক্ষের আরজি অনুযায়ীই ঐ শালগ্রাম শিলাকে আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ সেটা না জেনেই আক্রমণ করেছিলেন নরিসকে। উমেশচন্দ্র আদালতে

অনুরোধ জানালেন ক্ষমা প্রার্থনা আর সামান্য জরিমানা নিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে। কিন্তু তা হয়নি। বিচার আরম্ভ হয় ফুল বেঞ্চে। আর বিচারের রায় বেরোয়—ছ'মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড। তা নিয়ে প্রবল আন্দোলন হয় সারা দেশে। সে আন্দোলনের ঝড়-ঝাপটা মিলতে না মিলতেই এসে গেল ইলবার্ট বিলকে নিয়ে আর এক দফা বড় আন্দোলন।

তারপর লর্ড রিপনের আমল গিয়ে এল ডাফরিনের আমল। তিনি জানালেন, বিলেতে যেমন একদল লোক মন্ত্রী হয়ে দেশ শাসন করে আর একদল লোক বিরোধীপক্ষের ভূমিকা নিয়ে সরকারকে জানিয়ে দেয় কী তার করা উচিত বা উচিত নয়, ভারতবর্ষেও তেমনি প্রথার প্রচলন হওয়া উচিত।

ওদিকে ইলবার্ট বিলের প্রতিক্রিয়া থেকে সুরেন্দ্রনাথ তৈরি করলেন ন্যাশনাল কনফারেন্স। আর এই ন্যাশনাল কনফারেন্সের অধিবেশন বসছে যখন কলকাতায়, তখনই বোম্বায়ে বসল ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন। সভাপতির আসনে উমেশচন্দ্র। সেই অধিবেশনে উমেশচন্দ্র কংগ্রেসের উদ্দেশ্য—অভিপ্রায়ের কথা বলতে গিয়ে জানালেন, "এই কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে একতা স্থাপন করবে এবং জাতীয় ভাব, জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধি করবে। আমরা য়ুরোপের দেশগুলির মতো আমাদের শাসনকার্যে আমাদের প্রাপ্য ন্যায্য অংশ গ্রহণ করতে চাই।"

উমেশচন্দ্র ছাড়া বোম্বায়ের সে অধিবেশনে যোগ দেবার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন যে তিনজন বাঙালী, তাঁরা হলেন সাংবাদিক। সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন বসু প্রমুখদের ডাক পড়েনি। অবশ্য সুরেন্দ্রনাথ জানিয়ে-ছেন যে তিনি আমন্ত্রণ পেয়েও যেতে পারেননি, যেহেতু তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল কলকাতার কনফারেন্সে।

বোম্বায়ে যখন অধিবেশন, রবীন্দ্রনাথ তখন সেখানে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অসুস্থ হওয়ার খবর পেয়ে ছুটে গেছেন। থাকতেন বান্দ্রায়। তাঁর চোখে পড়েছিল ঐ অধিবেশনে বাঙালীর গরহাজিরা। তার থেকেই এই গান

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ
শুনিতে পেয়েছি ঐ
সবাই এসেছে লইয়া নিশান
কইরে বাঙালী কই।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের পর উমেশচন্দ্রকে ভারতের রাজনীতিতে খুব সামনের সারিতে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি কখনো। কিন্তু তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবেই জড়িয়ে ছিলেন তখনকার কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে। তিনি চাইতেন স্বদেশী শিল্পের বিকাশ। চাইতেন বর্ণভেদ বা জাতিভেদ প্রথার বিলোপ। ইংরেজ রাজত্বকে বিলোপ করে ভারতের স্বাধীনতার কথা ভাবেননি কখনো। তাঁর মতো সাহেব মানুষের পক্ষে তখন অতটা ভাবাও হয়তো সম্ভব ছিল না।

১৯০২-এ ভাঙা শরীর জোড়া লাগাতে আবার গেলেন বিলেতে। থাকতেন ক্রয়ডেনে। সেখানেই একটি বাড়ি কিনে নাম দিয়েছিলেন, 'খিদিরপুর হাউস'। সেখানেই তাঁর মৃত্যু। তাঁর চরিত্রের নানা গুণের দিকে তাকিয়ে গোখলে একবার বলেছিলেন, কোনো স্বাধীন দেশে জন্মালে তিনি হতে পারতেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রথম সার্কাস

সার্কাস আর শীত, এদের আলাদা করা কঠিন, তাই না? কলকাতায় এখানে ওখানে খুব জমে উঠেছে সার্কাসের খেলা। মজা করে দেখছে। শুধু তোমরাই নয়, গোটা দেশের লোক মজা পাবে জেনেই একজন বাঙালী এদেশে, এই কলকাতা শহরে, সার্কাসের দল খুলেছিলেন প্রথম। কলকাতায় তখন একটা মেলা শুরু হয়েছে। নাম হিন্দু মেলা। এই মেলাতে যা কিছু ঘটবে, সবই হবে স্বদেশী—এই ছিল যাঁরা এর কর্ণধার তাঁদের ইচ্ছে। এই মেলার প্রধান হোতা যিনি তাঁর নাম নবগোপাল মিত্র। শুধু স্বদেশী মেলা করেই তাঁর মনে সুখ নেই। স্বদেশী সার্কাসও গড়ে তুললেন নিজের চেষ্টায়। নাম 'ন্যাশনাল সার্কাস'। কলকাতা শহরে বাঙালীদের তৈরি সেই প্রথম সার্কাস।

অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া'-য় নবগোপালের সার্কাস গড়ার যে কাহিনী, তা একদিকে যেমন ইতিহাস অন্যদিকে তেমনি যেন রূপকথার মতো গল্প। "বাবামশায় তখন মারা গেছেন, নবগোপাল মিত্রর বৃদ্ধ অবস্থা, তখনো তাঁর শখ একটা না একটা কিছু ন্যাশনাল করতে হবে। আমরা তখন বেশ বড়ো হয়েছি, একদিন নবগোপাল মিত্তির এসে উপস্থিত; বললেন, একটা কাণ্ড করছি, দেশি সার্কাস পার্টি খুলছি। ও ব্যাটারাই সার্কাস দেখাতে পারে, আর আমরা পারিনে, তোমাদের যেতে হবে।

আমি বললুম, সে কী কথা, সার্কাস পার্টি ! মেম যে ঘোড়ার পিঠে চড়ে নাচে, সে কোথায় পাবেন আপনি ?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি সব জোগাড়-যন্তোর করেছি, শিখিয়েছি, তৈরি করেছি কেমন সব দেখবে খন।

গেলুম আমরা নবগোপাল মিত্তিরের দেশী সার্কাস পার্টিতে। না গিয়ে পারি ? একটা গলিজ জায়গা ; গিয়ে দেখি ছোট্ট একখানা তাঁবু ফেলেছে, কয়েকখানা ভাঙা বেঞ্চি ভিতরে, আমরা ও আরো কয়েকজন জানাশোনা ভদ্রলোক বসেছি। সার্কাস শুরু হল। টুকিটাকি দুটো-একটা খেলার পর শেষ হবে ঘোড়ার খেলা দেখিয়ে। দেশি মেয়ে ঘোড়ার খেলা দেখাবে। দেখি কোত্থেকে একটা ঘোড়া হাড়গোড়-চেহারা ধরে আনা হয়েছে, মেয়েও একটি জোগাড় হয়েছে ; সেই মেয়েকে সার্কাসের মেমের মতো টাইট পোশাক পরিয়ে সাজানো হয়েছে। দেশি মেয়ে ঘোড়ায় চেপে তো খানিক দৌড়ঝাঁপ করে খেলা শেষ করলে। এই হল দেশি সার্কাস।”

এরপরই ‘গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস’। অল্প দিনে নাম করেছিল খুব। কিন্তু বেশী দিন চলেনি।

তারপর তৈরি হল গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস। সেটা তৈরি করলেন প্রিয়নাথ বসু। সেকালের নামজাদা নাট্যকার মনোমোহন বসুর ছেলে। নবগোপালের ন্যাশনাল সার্কাসের তাঁবু, ঘোড়া কুকুর বাঁদর যা যা ছিল, সেই সব কিনে নিয়েই এই নতুন দল। ঢাল তরোয়াল নেই, কিন্তু উৎসাহ-উদ্যম অফুরন্ত। এই সময়ে আরেকটা সার্কাসের দল ছিল কলকাতায়। গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস। সেটার তখন পড়-পড় মরমর অবস্থা। প্রিয়নাথ সেই সার্কাসের জিনিসপত্রও কিনে নিলেন। দেখতে দেখতে, বেশ জমে উঠল গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস। শহরে গ্রামে খুব নাম ডাক। তখনও কোন সার্কাসে বাঘ ছিল না। একবার রেওয়ার মহারাজা এই সার্কাস দেখে ভারী খুশী। সঙ্গে সঙ্গে কবুল করলেন, গ্রেট বেঙ্গলকে উপহার দেবেন দুটো বাঘ। একজনের নাম লক্ষ্মী আরেক জনের নাম নারায়ণ। দলে

বাঘ আসতেই আরো হৈহৈ রৈরৈ ব্যাপার। গোটা ভারতবর্ষ থেকে ডাক আসে। আজ কাশ্মীর তো কাল হায়দ্রাবাদ।

এসব কথা ১৮৯৬-৯৭-এর। গ্রেট বেঙ্গল প্রথম তৈরি হয় ১৮৮৭-তে। তারপর এগিয়ে এল ১৯০৫। এই সময়ে ইংরেজরা বাংলাদেশকে কেটে দু' ভাগ করেছিল। তার বিরুদ্ধে সারা দেশে তুমুল প্রতিবাদ। তার থেকেই স্বদেশী আন্দোলন। দেশপ্রেমের বান ডেকেছে চারিদিকে। প্রিয়নাথ বসুর সার্কাসও তার থেকে বাইরে নয়। সার্কাস শুরু হবার আগেই স্বদেশী গান।

ভারত সন্তান সব
জাগ রে জাগ আজ।

গানের পর খেলা। খেলার ফাঁকে ফাঁকে আবার দেশপ্রেমের বক্তৃতা। এবং ফলে প্রিয়নাথ বসু আর তার সার্কাসের এমন নামডাক হয়ে গেল, তখনকার কালের নামী নামী লোকেরাও এই সার্কাসের খেলা দেখতে ছুটে আসতেন। এমনি একবার এসেছিলেন লালা লাজপৎ রায়। প্রিয়নাথ বসু তাঁকে সম্মান জানানোর জন্যেও একটা গান লিখেছিলেন।

এসব তো বাইরের ব্যাপার। আসল সার্কাস, অর্থাৎ খাঁচার ভিতরে সেই যে দুটো ডোরাকাটা বাঘ, তাদের কথা বলাই হয়নি এখনো। তার আগে নবগোপালের সম্বন্ধে আরো কিছু কথা।

কোন্নগরে মিত্তিরবাড়ির ছেলে নবগোপাল। হিন্দু স্কুলের ছাত্র। কিছুদিন আইন পড়েছিলেন। তারপর সব বাদ শুধু স্বদেশীর কাজ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দরজা সব সময়েই খোলা থাকতো তাঁর জন্যে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্নেহও করতেন খুব। ব্রাহ্মসমাজ নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন কেশব সেনের বিবাদ, নবগোপাল সেই সময় দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং গণেন্দ্রনাথদের সঙ্গেও ভাব ভালবাসা ছিল জমজমাট। নবগোপালের যা কিছু জাতীয় উদ্যমের পিছনে এঁরা দু'জন মদত দিয়ে গেছেন সব সময়েই। হিন্দু মেলার ব্যাপারে গণেন্দ্রনাথ ছিলেন নবগোপালের দক্ষিণ

হস্ত। তিনিই ছিলেন হিন্দু মেলা পরিচালনা সাব-কমিটির সম্পাদক। তাঁর কথা পরের বারে শুনবে।

হিন্দু মেলার সাফল্যের পিছনে ছিল আরেকজনেরও প্রচণ্ড উৎসাহ। তিনি রাজনারায়ণ বসু। ১৮৭৫ সালে যে মেলা হয়, তিনিই ছিলেন প্রধান পুরোহিত। সেবারের মেলা বসেছিল কলকাতার পার্শীর বাগান নামে তখনকার এক বিখ্যাত বাগানে। বরোদা থেকে মৌলাবক্স নামে এক নামজাদা গায়ক এসেছিলেন গান গাইতে। যশোহরের নড়াল গ্রামের জমিদার রাইচরণ রায় বাঘ শিকারে বাহাদুরী দেখিয়ে পুরস্কার পেলেন সোনার পদক।

মেলার ভিতরে কত কী কাণ্ড। একজিবিশন, তাতে রকমারি কত কী। ছবি, খেলনাপত্র, শোলার পুতুল টুতুল, শাড়ি, গহনা। সন্ধ্যেবেলায় কথকতা, নাচগানের আসর। দিনেরবেলায় মজার মজার খেলা। তার মধ্যে একটা হল রোপওয়ার্ক। বলডুইন নামে এক সাহেব এসে বললে, আমি দড়ির উপর দিয়ে হাটব। শুনে তো সবাই তাজ্জব। পায়ে চাকার মতন কী একটা লাগিয়ে সত্যি সত্যিই সাহেব হেঁটে গেলেন দড়ির উপর দিয়েই। চারদিক থেকে করতালির ঝড়।

দূর দেশ থেকে বাঁশবাজীর খেলা দেখাতে এসেছিল বেদেনীরা। তারা এই দেখে বললে এ আর এমন কি। সাহেব তো খাঁজ-কাটা জুতো পরে হেঁটেছে। আমরা খালি পায়ে হাঁটতে পারি। শুধু হাঁটতে? নাচতে বললে, নেচেও দেখাতে পারি। যেমনটি মুখে বলা, সত্যি তারা তেমনি যখন করে দেখালে, সাহেবের তো মাথা হেঁট। আর যারা দেখল, খুশী আর ধরে না। এসব তোমরা জানতে পারবে অবন ঠাকুরের 'ঘরোয়া' থেকে। নবগোপাল সম্বন্ধে তিনি লিখে গেছেন :

"নবযুগের গোড়াপত্তন করলেন নবগোপাল মিত্তির। চার দিকে ভারত ভারত—ভারতী কাগজ বের হলো! বঙ্গ বলে কথা ছিল না তখন। ঐ তখন থেকেই সবাই ভারত নিয়ে ভাবতে শিখলে।"

নবগোপালকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সেকালের প্রায় সব মনীষীই। শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বইয়ে লিখেছেন :

"কেশবচন্দ্রর বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সোমপ্রকাশ, মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি, এই সকলের মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নবভাব আনিয়া দিতেছিল, তেমনি আর এক কার্যের আয়োজন হইয়া নব আকাঙ্ক্ষার উদয় করিয়াছিল। তাহা নবগোপাল মিত্রমহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় মেলা' নামক মেলা ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের তাঁহার সহিত যোগ।"

এবার সেই বাঘের গল্প। প্রিয়নাথ বসুর সার্কাসে বাঘের খেলা দেখিয়ে হাজার হাজার মানুষের হাততালি কুড়োতেন যিনি, তার নাম বাদলচাঁদ। প্রিয়নাথের নিজের হাতে তালিম দেওয়া ছেলে। ভয়-ভ্রূক্ষেপ নেই। বাদলচাঁদ সোজা ঢুকে পড়ত খাঁচার মধ্যে। আঙুলে তুড়ি মেরে ডাক দিলেই, অমন যে জাঁদরেল জানোয়ার, যেন পোষা বেড়ালের মত এসে ভর দিয়ে দাঁড়াত তার দু' কাঁধে। তারপর চলত মল্লযুদ্ধ। খেলা শেষ হবার মুখে বাদলচাঁদ শুয়ে পড়ত খাঁচার ভিতরে। একটা বাঘ তখন তার মাথার বালিশ। আরেকটা বাঘকে বুকের উপর তুলে নিয়ে কত রকমের কসরৎ। দর্শকরা ভয়ে আঁৎকে উঠত। এই রে, বাঘের মুখে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে। এবার আর বাঁচোয়া নেই। অনেক দর্শক আসন ছেড়ে ছুটেই পালাত তাঁবুর ত্রিসীমানার বাইরে। কিন্তু বাদলচাঁদ অবিচল। বাঘের সঙ্গে তার এমন ভাবভালোবাসা যে, অনেকদিন খেলার সময়ের বাইরে, বাঘের খাঁচার মধ্যেই সেরে নিত দুপুরবেলার ঘুম।

বাদলচাঁদ তবু তো ছেলে। কিন্তু তাকেও যে হার মানাল, সে এক মেয়ে। নাম সুশীলাসুন্দরী। মিস্ সুশীলাসুন্দরী। বাঘের গালে চুমো খাচ্ছে এক মহিলা, এই দৃশ্য দেখে তখনকার মানুষজন থ। ইংলিশম্যান তখনকার কালের নামজাদা কাগজ। তারা পর্যন্ত সুশীলাসুন্দরীর প্রশংসায়

পঞ্চমুখ। তাদের ধারণা ছিল হিন্দু পরিবারের মেয়েরা বড় লাজুক। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে সেই বাংলা দেশেরই একটা মেয়ে যে এইভাবে বাঘের সঙ্গে দুঃসাহসের খেলায় যোগ দিতে এগিয়ে আসবে, এটা তারা ভাবেনি। সেই জন্যে সুশীলাসুন্দরীকে কাগজে কাগজে এত ধন্যবাদ।

সুশীলার জীবনে যা কিছু নামডাক সবই ঐ বাঘের খেলা থেকে। সুশীলার জীবনে যা কিছু দুঃখকষ্ট তাও ঐ বাঘের দৌলতেই। 'ফরচুন' নামে নতুন একটা বাঘের সঙ্গে খেলা করতে গিয়ে হঠাৎ একদিন সেই বাঘটা কাঁধে বসিয়ে দিলে থাবা। বরাত জোরে তখুনি মারা গেলেন না বটে, কিন্তু পঙ্গু করে দিল চিরকালের মত।

'ফরচুন' নামের বাঘটা এসেছিল 'ডিউক' মারা যাবার আগে। ডিউকের আগে ছিল কারা, নাম তোমরা জানো? লক্ষ্মী এবং নারায়ণ। প্রথমে মারা যায় নারায়ণ। তার পরে লক্ষ্মী। স্বামীকে হারিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কেঁদে গেছে।

আরও দুটো ভারি মজার জানোয়ার ছিল প্রিয়নাথের সার্কাসে। বাঘ নয়। হাতি। একজনের নাম চুনি। আর একজনের নাম গোল্ডী। যেহেতু তার গায়ের রঙটা সোনার বরণ।

সুশীলাসুন্দরী ছাড়াও আরো একটি মেয়ে দেখাত বাঘের খেলা। তার নাম মৃন্ময়ী। হাতির পিঠে চেপেও খেলা দেখাত নানান রকমের। জিমনাস্টিকের খেলা দেখাত সুশীলাসুন্দরীর বোন কুমুদিনী।

পরের দিকে প্রফেসর বোস-এর সার্কাসে যোগ দিলেন বিখ্যাত যাদুকর সরকার। তিনি সার্কাসে ঢুকেছিলেন সিন পেণ্টার হিসেবে। প্রফেসর বোসই উৎসাহ দেখিয়ে তাঁর ভিতরে লুকিয়ে থাকা যাদু-বিদ্যার প্রতিভাকে টেনে আনলেন জনসাধারণের চোখের সামনে।

'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' শুধু ভারতবর্ষকেই মাতায়নি। মালয়, সুমাত্রা, জাভা-র মানুষকেও মুগ্ধ করেছেন প্রিয়নাথ। আর সার্কাস দেখাতে দেখাতেই, ঐ মালয়ে, অসুস্থ হয়ে আর ফিরতে পারলেন না নিজের জন্মভূমিতে। মৃত্যু হল বিদেশে। শেষ হল সার্কাসের সোনার যুগ।

প্রথম সিভিলিয়ান

ভারতবর্ষের প্রথম সিভিলিয়ান যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তা আমাদের সকলেরই জানা। তবে অনেক আগে সত্যেন্দ্রনাথের এই সম্মান কেড়ে নিতে পারতেন আর একজন। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের পোষ্যপুত্র রাজারাম রায়। রামমোহনের যে সব বন্ধুবান্ধব ছিলেন ইংলণ্ডে তাঁরাই এ প্রস্তাব পেশ করেছিলেন কোম্পানীর কোর্ট অফ ডাইরেক্টরদের কাছে। কিন্তু সে প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়া হয় এই অজুহাতে যে হেইলিবেরি কলেজে পড়াটা রাজারামের পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে। অসুবিধে হওয়ার কারণ ছিল না কিন্তু আদৌ। রাজারাম পড়াশোনা করতেন ইংলণ্ডে। সেখানকার জলহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে। আসল ব্যাপারটা অন্য। ভারতীয়রা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে ইংরেজদের সমান সমান হয়ে উঠবে যোগ্যতার ক্ষমতায়, তখনকার ইংরেজ শাসনকর্তাদের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া ছিল অসম্ভব রকমের অপমানজনক। হেইলিবেরি কলেজ থেকে পাশ করা লোকদের দিয়েই তখন চালানো হত ভারতবর্ষের সিভিল সার্ভিস। আর ঐ কলেজে পড়ার সুযোগ পেত কোম্পানীর পরিচালকবর্গের আর বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের মনোনীত ছেলেরাই। অর্থাৎ স্বজনপোষণ। ১৮০৬ থেকে শুরু করে পঞ্চাশ বছর একটানা চলেছে এই রকম নিয়ম। এই ব্যবস্থাকে পাল্টানোর জন্যে যেমন ইংলণ্ডে, তেমনি ভারতবর্ষে আন্দোলন হয়েছিল

বিস্তর। তবুও ভারতীয়রা যাতে এই বিশেষ পদটিতে কোনভাবেই মাথা গলাতে না পারে, তার জন্যে কখনো বয়সের সীমা কমিয়ে, পরীক্ষায় সংস্কৃত আর আরবীর নম্বর কমিয়ে প্যাঁচ কষা হয়েছে বিস্তর। এত সব ঝক্কি-ঝামেলা সামলেও ১৮৬৪-তে ষোলজন পরীক্ষায় বসেছিলেন, তার মধ্যে সফল হলেন মাত্র একজন। তিনিই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে বিলেত রওনা হন ১৮ বছর বয়সে। তারিখ ১৮৬২-র ২৩ মার্চ। পরীক্ষায় পাশ করে ভারতবর্ষে ফিরে চাকরিতে যোগ দিলেন ১৮৭৪-র ১২ ডিসেম্বর।

সত্যেন্দ্রনাথ বহুগুণের মানুষ। উদার, সংস্কারহীন আর প্রগতিশীল চরিত্রের এই মানুষটি যেন নিজের পরিবারে, তেমনি নিজের দেশে ঘটিয়ে গেছেন এমন সব ঘটনা যা তখনকার সময়ের পক্ষে বিপ্লব ঘটানোর মতই। প্রথমেই ধরা যাক আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা। সত্যেন্দ্রনাথের সময়ে আমাদের দেশের মেয়েরা ছিল ঘরের চারদেয়ালের আড়ালে বন্দী। সত্যেন্দ্রনাথের মন ছেলেবেলা থেকেই এর বিরুদ্ধে কিছু একটা করার জন্যে অস্থির। নিজের আত্মচরিতে লিখেছেনও সে সব কথা।

"আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতি, মা আমাকে অনেক সময় ধমকাইতেন, 'তুই মেয়েদের নিয়ে মেম সাহেবের মত গড়ের মাঠে বেড়াতে যাবি নাকি।'…আমাদের অন্তঃপুরে যে কয়েদখানার মত নবাবী বন্দোবস্ত ছিল তা আমার ভালো লাগিত না, আমার মনে হতো এই পর্দাপ্রথা আমাদের জাতির নিজস্ব নয়, মুসলমান বাড়ির অনুকরণ। অনুকরণ এবং, মুসলমান অত্যাচার হতে আত্মরক্ষা এই দুই কারণ হতে তার উৎপত্তি হতে পারে। আমাদের প্রাচীন হিন্দু আচার অন্যতর। এই অবরোধ প্রথা আমার অনিষ্টকর কুপ্রথা বলে মনে হতো। আমি গোপনে আমার এক বন্ধুকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার কত ফন্দী করতুম এখন মনে হলে হাসি পায়। John Stuart Mill-এর Subjection of Women গ্রন্থ আমার সাধের পুস্তক ছিল ; আর তাই পড়ে 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' নামে একটা

প্যাম্পলেট বের করেছিলুম। বিলেতে গিয়ে আমি দেখতুম স্ত্রী-পুরুষ কেমন স্বাধীনভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে মেলামেশা করছে। গার্হস্থ্য জীবনে তাদের মেয়েদের কি মোহন সুন্দর প্রভাব। কত বিবাহিতা অবিবাহিতা রমণী সমাজের বিবিধ মঙ্গলব্রতে জীবন উৎসর্গ করে স্বাধীনভাবে বিচরণ করছেন।" মাথায় একগলা ঘোমটা, পায়ে গুজরী-পঞ্চম আর গায়ে এক-গা গয়না পরে সাত বছর বয়সে জ্ঞানদানন্দিনী যশোর থেকে জোড়া-সাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে এসেছিলেন। বাড়ির মেজ বৌ অর্থাৎ সত্যেন্দ্র-নাথের স্ত্রী হয়ে। সত্যেন্দ্রনাথ যখন বিলেতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্যে, তখন সেখান থেকে অনেক কাতর চিঠি লিখেছেন যেমন জ্ঞানদা-নন্দিনীকে, তেমনি অনুনয়-অনুরোধ জানিয়েছেন বাবা দেবেন্দ্রনাথকে, যাতে তাঁরা জ্ঞানদানন্দিনীকে পাঠিয়ে দেন বিলেতে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সাড়া দেননি সে প্রস্তাবে। সিভিল সার্ভিস পাশ করে ফিরে এসেছেন কলকাতায়। চাকরীর জায়গা বোম্বাই। আবার বাবার কাছে সেই প্রস্তাব। আমি চাকরীক্ষেত্রে স্ত্রীকে নিয়ে যেতে চাই সঙ্গে। এবারে দেবেন্দ্রনাথের সম্মতি। সত্যেন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন স্ত্রী-স্বাধীনতার দ্বার খোলার এক মহাসুযোগ এসে গেছে হাতের নাগালে। ঠাকুরবাড়ির চিরকালের প্রথাকে না মেনে তিনি অন্দরমহল থেকে স্ত্রীকে পাশে নিয়ে হেঁটে বাইরে গিয়ে উঠতেন গাড়িতে। কিন্তু পারলেন না। হার মানতে হল সমবেত প্রতিবাদে। অগত্যা ঘেরাটোপ দেওয়া পালকিতে চেপেই জ্ঞানদানন্দিনীকে অন্তঃপুর থেকে আসতে হল বাইরে। বোম্বায়ে পৌঁছেই সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানদানন্দিনীকে গড়লেন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে। বোম্বায়ে দু'বছর কাটিয়ে কলকাতার বাড়িতে ফিরলেন যখন, তখন জ্ঞানদানন্দিনী একেবারে অন্য মহিলা। ঠাকুরবাড়ির চেখে বিদেশিনী। ফলে নিজের বাড়িতেই তিনি একঘরে। সত্যেন্দ্রনাথের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। মেয়েদের মুক্তির আলোয় টেনে আনার আগ্রহে তখনো তিনি টগবগে ঘোড়ার মত। কলকাতায় পৌঁছনোর কিছুদিন পরে গভর্নমেণ্ট হাউসে নিমন্ত্রণ। ঠাকুরবাড়ির নিয়মকানুন ভেঙে তিনি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে চললেন সেখানে।

"আমি প্রথমবার বোম্বাই থেকে বাড়ি এসে আমার স্ত্রীকে গভর্নমেণ্ট হাউসে নিয়ে গিয়েছিলুম। সে কি মহাব্যাপার। শত শত ইংরাজ মহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী সেখানে একমাত্র বঙ্গবালা। তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তিনি ত ঘরের বৌকে প্রকাশ্য স্থলে দেখে রাগে লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। এখন এসব কথা গল্পের মতই মনে হয়। এইরূপে ক্রমে স্বাধীনতার পথ পরিষ্কৃত হয়ে এল। এইরূপে ক্রমে আমাদের বাড়ির লোকেরা (মেয়ে-পুরুষ) আমার ওখানে গিয়ে মধ্যে মধ্যে প্রবাস যাপন করতে লাগলেন। ওদেশে বোম্বাই মাদ্রাজে কোথাও বাংলাদেশের মত মেয়েদের অবরোধ প্রথা নেই। স্ত্রী-স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু সেবন করে তাঁদের মনোভাব অনেক পরিমাণে বদলে গেল।"

জীবনের শুরু থেকেই স্বাদেশিকতার মন্ত্রে সত্যেন্দ্রনাথের দীক্ষা। রবীন্দ্রনাথের যখন বয়স মাত্র পাঁচ, তখন নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে কলকাতায় শুরু হল 'হিন্দু মেলা' নামে এক বাৎসরিক মেলা। ঠাকুরবাড়ির সকলেই সে মেলার সঙ্গে যুক্ত। সত্যেন্দ্রনাথ একবারে মেলায় গাইবার জন্যে লিখলেন 'মিলে সব ভারতসন্তান, একতান মনপ্রাণ'।

রবীন্দ্রনাথকে গড়ে-পিঠে নিজের মনের মতো করে মানুষ করবেন বলেই বোম্বায়ে নিজের কাছে রেখে ইংরেজি শিখিয়েছেন। যখন যা বই চেয়েছেন কিনে দিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে। তারপর পাঠিয়েছেন বিলেতে। পরে আরো একবার নিজে নিয়ে গেছেন সঙ্গে করে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে শিখিয়েছেন ফরাসী ভাষা আর সেতার। ঠাকুরবাড়িতে চালু করেছেন 'জন্মদিন' পালনের উৎসব। রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করেছেন মূল মারাঠি থেকে তুকারামের 'অভঙ্গ' অনুবাদের ব্যাপারে। আমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে থাকার সময়ই দাদার লাইব্রেরী থেকে পাওয়া ইংরেজি আর সংস্কৃত ভাষার অজস্র বই রবীন্দ্রনাথের ভিতরের লুকিয়ে থাকা কবিকে জাগিয়ে দিয়েছিল ঘুম থেকে।

আর সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী আমূল বদলে দিয়েছিলেন বাঙালী মেয়ের শাড়ি পরার ধরন, পার্সি আর গুজরাটি মেয়েদের অনুকরণে।

—